শাহ্ সিমেন্ট সাপ্তাহিক ২০০০ গোলটেবিল

২ আগস্ট। প্রেসক্লাবের কনফারেন্স রুম। স্থপতি, পরিকল্পনাবিদ, পরিবেশবিদ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং আবাসন শিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আলোচনায় জমে ওঠে গোলটেবিল বৈঠক। বের হয়ে আসে বিভিন্ন সমস্যা এবং দিক নির্দেশনা...

পরিকল্পিত নগরায়ণ এবং আবাসন শিল্প

গোলাম মোর্তোজা: নির্ধারিত সময়ের প্রায় ৩০ মিনিট পর আমরা আমাদের পরিকল্পিত নগরায়ণবিষয়ক আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি। আজকের এই গোলটেবিল আলোচনার মূলপ্রবন্ধ লিখেছেন স্থপতি তানভীর আহমেদ এবং সাপ্তাহিক ২০০০-এর সিনিয়র রিপোর্টার জব্বার হোসেন।

আলোচনার শুরুতে আমি স্থপতি তানভীর আহমেদকে সংক্ষেপে প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি। আমরা চাইবো, যারা আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন, তারা যার যার দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার বিষয়বস্তু কীভাবে দেখছেন তা তুলে ধরবেন।

তানভীর আহমেদ : আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় পরিকল্পিত নগরায়ণ ও আবাসন শিল্প। খুব সহজ ভাষায় বলতে নগরায়ণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শহরের সীমানা বৃদ্ধি হয়। অর্থাৎ যার, মাধ্যমে সমাজ বেশি পরিমাণে নগর হয়ে উঠতে থাকে। ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে বলা যায় নগরায়ণ হলো সময়ের সঙ্গে মানুষের বৃদ্ধি ও মমত্ব। তাতে ব্যবসাবাণিজ্য ও অন্যান্য কাজকর্মের প্রতিফলন হয়। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কখনো শহরের চাকরিজীবী জনসাধারণকে ওপরের স্তরে নিয়ে আসে এবং গ্রামের মানুষকে মাইগ্রেশনের মাধ্যমে দূরে সরিয়ে দেয়। এর ফলে শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেননা, সবাই শহরমুখী হয়ে পড়ে। এর ফলে শহরের সীমানা বৃদ্ধি পায়।

কিছু লোক পাওয়া যায়, যারা ভাগ্যের অন্বেষণে শহরে চলে আসে। এভাবেই আমাদের নগরায়ণ হচ্ছে। আরবানাইজেশন লেভেলটাকে অনেকে ভেবে নেয় পরিকল্পিত নগরায়ণ। আমাদের নগরায়ণ অনেকখানি অপরিকল্পিত। ফলে আমরা হাজারো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। পরিকল্পনাকে ততখানি আঞ্চলিক করা যাচ্ছে না। কেননা, মানুষ কতোখানি গ্রহণ করবে তা বোঝা যাচ্ছে না। আমাদের একটা পরিকল্পনা ছিল যে, আমরা একটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দিকে যাবো। কিন্তু কিছু কিছু পরিকল্পনা শুরুর দিকে বাস্তবায়ন করা যায়নি। একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকে আছে PNDC. এ ধরনের সমস্যা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা আছে। সরকারের পাশাপাশি যারা ডেভেলপার আছেন, তাদেরও নগরায়ণের ক্ষেত্রে আমাদের সোসাইটিতে একটা ভূমিকা আছে। পরবর্তীতে দ্রুত নগরায়ণের ফলে যে সমস্যাগুলো হচ্ছে, সেগুলো বেশির ভাগই ঢাকার দিকে চলে আসছে। বাংলাদেশের নগরায়ণটা অনেকখানিই ঢাকাকেন্দ্রিক। কিন্তু আমাদের পাশের দেশ যেমন ইন্ডিয়ার কথাই ধরা যাক; ওখানে উত্তর প্রদেশ, কলকাতা, দিল্লিতে নগরায়ণ হচ্ছে সংযুক্তভাবে। ওদের দেশের প্রতিটি প্রদেশের প্রতি আলাদা দৃষ্টি দিয়ে নগরায়ণটা পরিকল্পিতভাবে করছে। ওদের দেশের সিস্টেমটা অনেক উন্নত। কিন্তু আমাদের দেশে

জন্ম, সৃষ্টির লক্ষ্যে
শাহ্ সিমেন্ট

Born to Build
SHAH CEMENT

এমনটা হচ্ছে না। কারণ বেশির ভাগ মানুষ ভাগ্যান্বেষণে ঢাকায় চলে আসছে। ফলে নগরায়ণটা ঢাকাকেন্দ্রিক হচ্ছে। এরপর আমরা সমস্যাগুলোর দিকে চলে আসি। আমরা চিন্তা করি ১০০ থেকে ১৫০ বছর পরে কী কী হতে পারে। নগরায়ণের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা থাকা উচিত। আমরা যদি নগরায়ণের ক্ষেত্রে বিস্তৃত পরিকল্পনা করি, তাহলে এখন থেকেই সেভাবে প্ল্যান করতে হবে। কারণ ইতিমধ্যে ঢাকায় খালি জমিগুলো দখল করে ফেলা হচ্ছে এবং জায়গাগুলো ভরাট করে অনেক কিছু করা হয়েছে। ফলে জলাবদ্ধতার সমস্যা হচ্ছে। অল্প বৃষ্টিতেই পানি জমে যাচ্ছে। ঢাকা ইতিমধ্যে একটি ঘনবসতিপূর্ণ শহরে পরিণত হয়েছে। যেহেতু সমস্যাগুলো ইতিমধ্যে হয়ে গেছে, তাই আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। নগরায়ণ ও দ্রুত নগরায়ণে যেমন, ধানমন্ডি এরিয়াকে শুরুতেই মনে করা হতো একটা দুই তলাবিশিষ্ট আবাসিক এলাকা হিসেবে। সে অনুযায়ী শুরুতে ইন্টার স্ট্রাকচারটা করা হয়েছিল, ওয়াটার পাম্প লাইন ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছিল। পরবর্তীতে আবার ১২ তলারও অনুমতি দেয়া হয়েছিল। তারপরও বর্তমানে ৬ তলার মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। প্রত্যেকটা প্লটে যখন ৬ তলা ভবন হয়ে যাবে, তখন এর ডিমান্ড অনেক বেড়ে যাবে। প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে প্রায় ৩ গুণ ডিমান্ড বেড়ে যাচ্ছে। এ ডিমান্ডটা পূরণ করার জন্য ইন্টার স্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট সিস্টেমগুলো আরো ডেভেলপ করা প্রয়োজন। কিন্তু সেভাবে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে না। ফলে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। পরবর্তীতে আসে নগর পরিকল্পনায় মিউনিসিপ্যালিটি ম্যানেজমেন্টের বিষয়টি। আমাদের যে সেটআপ আছে, তার তুলনায় মানুষ অনেক বেশি। ফলে সমস্যা হচ্ছে। আর সবচেয়ে হুমকির সম্মুখীন বলা হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশকে। সবুজকে আমরা দিন দিন হারাচ্ছি। বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে কখনো বারান্দায়, কখনো ছাদে, কখনো পার্কিংয়ের জায়গায় সবুজকে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার চেষ্টা করি। যেহেতু আমাদের বাণিজ্যিক এবং আবাসিক এলাকার সুনির্দিষ্ট একটা সীমারেখা নেই। যেমন আমাদের মিক্সড এনভায়রনমেন্ট হয়ে যাচ্ছে সব জায়গায়। যেমন ধানমন্ডির কথায় আসা যাক। এখানে মানুষ বসবাস করছে, অফিস আছে, স্কুল আছে, ক্লিনিক আছে। পাশাপাশি আছে শপিং সেন্টার। ফলে এক জায়গায় অনেক চাপের সৃষ্টি হচ্ছে। রেসিডেন্সিয়াল প্রাইভেসিও নষ্ট হচ্ছে। সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। নগরায়ণের ক্ষেত্রে আমাদের রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারদের অনেক ভূমিকা রয়েছে। সেটাকে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে দেখা যায়, ১৯৯০-২০০২ সাল পর্যন্ত আমাদের জিডিপি বেড়েছে ৪.৬ শতাংশ হারে, যেখানে রিয়েল এস্টেট হাউজিং খাতে বেড়েছে ৪.৮ শতাংশ। সেই সঙ্গে ডেভেলপমেন্ট খাতে বেড়েছে ৭.৫%। ১৯৯৯-২০০০ সালে এক জরিপে দেখা যায় যে, মোট শ্রমশক্তির ২.১% নির্মাণের সঙ্গে জড়িত ছিল। এটাও একটা বড় ব্যাপার। এছাড়াও আছে ক্ষুদ্র শিল্প ব্যবসায়ীরা যেমন রঙ, গ্লাস এ ধরনের সংযুক্ত শিল্প। দেখা যায় যে, সরকারের রাজস্ব খাতেও রিয়েল এস্টেট শিল্পের বড় ভূমিকা রয়েছে। সে কারণে এই শিল্পটাকেও উৎসাহিত করা প্রয়োজন। আমরা ডেভেলপারদের প্রতিপক্ষ ভাবি। কিন্তু এরাই সরকারকে সাহায্য করছে।

নির্মাণ ক্ষেত্রে সরকার কিছু নতুন নতুন আইন দিয়ে দিচ্ছে, যা ডেভেলপ করার জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে পড়ছে। নির্মাণ শিল্পের দাম বেড়ে চলছে। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, রডের দাম বেড়ে যাওয়ায় নির্মাণ ক্ষেত্রে অস্থিরতা বিরাজ করছে।

আমাদের কী করা উচিত। আমাদের নগরায়ণ যে শহরকেন্দ্রিক হয়ে গেছে, এটাকে অতিক্রম করতে হবে। অন্য শহরের দিকে আমরা যখন চলে যাবো, তখন ঢাকা কেন্দ্রিকতা কমে যাবে। ফলে ইকুভ্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট টোটাল কান্ট্রিতে হয়ে যাবে। ফলে দেখা যাবে যে, ঢাকার জমির চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে, মানুষের থাকার সমস্যা বেড়ে যাচ্ছে, আরবান গ্রোথ রেট বেড়ে যাচ্ছে, সেগুলো কমে আসবে। পরিকল্পনাগুলো অনেক দীর্ঘমেয়াদি হতে হবে। সে ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন নীতিমালা ঠিক থাকতে হবে। রাস্তার নেটওয়ার্কটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। লিঙ্কেজগুলো কম, এগুলো বাড়াতে হবে। পরবর্তীতে রিভার ট্রান্সপোর্টকে উৎসাহিত করা যেতে পারে। যেমন, চট্টগ্রাম থেকে উত্তরবঙ্গে যে জিনিসগুলো যাচ্ছে, সেগুলো নদীপথে নিয়ে যেতে পারলে ব্যাপারটা আরো সহজ হবে। রাস্তার লোডটা কমে যাবে। বেসরকারি খাতে আমাদের আবাসিক শিল্প ডেভেলপ করার জন্য সরকার যদি আরো কিছু জায়গা ডেভলপ করে দিতে পারে ধানমন্ডির মতো, সেখানে আমাদের ডেভেলপাররা চলে যাবে এবং আমাদের ডেভেলপমেন্ট আরো ছড়িয়ে পড়বে। আমাদের ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা এবং এর ইন্টারেস্ট যদি আরো কমে যায় তাহলে ডেভেলপাররাও লাভবান হবে। আমাদের ক্রেতাদেরও সচেতন হতে হবে। এখন এটা নিয়ে আপনাদের মতামত জানানোর জন্য অনুরোধ করবো।

গোলাম মোর্তোজা : ধন্যবাদ তানভীর আহমেদ। আমরা এখন এ বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা শুনবো বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে। আমাদের নগর অধিদপ্তরের প্রধান স্থপতি আবদুস সালাম সাহেব। শুরুতে তার বক্তব্য শুনতে চাইছি।

আব্দুস সালাম : ধন্যবাদ মাননীয় মডারেটর। এই মাত্র গোলটেবিলে যে প্রবন্ধ পাঠ করা হলো, সেটা সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি। মি. মডারেটর, এখানে বলা হয়েছে সুনামি ভূমিকম্পের কথা। The last great disaster, যেখানে অনেক পরিকল্পনাবিহীন নকশা করা ইমারত আছে, যেগুলো যথাযথভাবে নকশাকৃতভাবে নির্মাণ করা না হলে এই ডিজাস্টার দেখা দেয়। ঢাকা শহরেও এ রকম অনেক ডিজাস্টার রয়েছে। তা থেকে আমাদের সবাইকে পরিত্রাণ পেতে হবে। বন্যার আগাম পূর্বাভাস পাওয়া যায়, কিন্তু কিভাবে বন্যা আসবে এটা জানা যায় না। আরেকটা কথা উনি বলেছেন, ডিজাইনিং। আমি বলি, বাংলাদেশ হওয়ার আগে পাকিস্তান আমলে ঢাকা শহরে ছোট একটি টাউনের ধারণায় মিরপুর, লালমাটিয়া, মোহাম্মদপুর- এ জায়গায়গুলো অত্যন্ত আধুনিক এবং বাস্তবসম্মত প্ল্যান হয়েছিল। কিন্তু আমরা সে রকমটি রাখতে পারিনি। বাড়ির খালি মাঠগুলো প্লটে রূপান্তরিত করেছি। রাস্তাগুলো ছোট করে শত শত মার্কেট করে দিয়েছি। যেটা যেভাবে পরিকল্পিত হয় সেটা যদি সেভাবে বাস্তবায়িত না হয় তাহলেই সমস্যাটা দেখা যায়। তাই আমরা আজকে ঢাকা শহরকে অপরিকল্পিত বলছি। কিন্তু এসব সমস্যার কারণেই এটা অপরিকল্পিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এ পর্যন্ত পাঁচবার মহাপরিকল্পনা হয়েছে। আরো যত দিনে ঢাকা শহরের আয়তন বাড়বে ততদিনে পরিকল্পনাও বৃদ্ধি পাবে। এটা বেশি কিছু নয়। অন্যান্য দেশে এগুলো ১০-১৫ বছর পর পর

রিহ্যাব যদি তার নীতি প্রণয়ন করতে চায় তাহলে ডেভেলপার এবং ক্রেতাদের মধ্যকার লেনদেনটা দেখতে হবে। সুতরাং পাবলিকদের সঙ্গে যদি সংলাপ করতে চায় রিহ্যাবকে এ মুহূর্তে সে উদ্যোগ নিতে হবে

ড. মোজাফ্ফর আহমদ
অর্থনীতিবিদ

Born to Build
SHAH CEMENT

রিভাইস করা হয়। আমাদের দেশে এ রকম প্রক্রিয়া যদি চলতে থাকে তাহলে আমরা এসব বিষয়ে আরো সচেতন হতে পারব। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আছে। পরিকল্পনা আইনের উন্নয়ন প্রয়োজন। আর আইনের ক্ষেত্রে ডেভেলপমেন্টের যে সব সমস্যা দেখা যায়, সেগুলো হলো- পানি, গ্যাস, আবর্জনা, রাস্তাঘাট, ট্রাফিক ও বিদ্যুৎ। ঢাকার ক্ষেত্রে যেটা লক্ষ্য করা যায়, আমাদের যে ডাস্টবিন তা জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করেছে। আমাদের যে খাল আছে, সেগুলো ভরাট হয়ে নির্মাণকাজ চলছে। আমার দৃষ্টিতে মনে হয়, এগুলোই হলো অপরিকল্পিত ব্যবস্থা। আজকে যদি আমাদের খালগুলো থাকতো তাহলে ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা সহজ হয়ে যেত। এ ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার সচেষ্ট আছে যে, এ জায়গাগুলো বাড়িয়ে চলাচলের পথ সৃষ্টি করা যায় কি না। কারণ যেখানে সেখানে অপরিকল্পিতভাবে ময়লা ফেলা হচ্ছে। পার্কিংয়ের সমস্যার কথাও বলা হয়েছে। রাজউক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আরো সচেতন হতে হবে, যেন কাজগুলো পরিকল্পিতভাবে সমাপ্ত হয়। শিল্প এলাকার কথা বলা হয়েছে। আমি স্থপতি, মানবসম্পদ পরিকল্পনাবিদ। আমার ৩২ বছর জীবনে এমন

সবচেয়ে বড় পরিকল্পনা ১৯৫৯ সালের মহাপরিকল্পনা। এ পরিকল্পনার জন্যই ঢাকা শহর একটি শহর, তা না হলে অনেক আগেই সাংঘাতিক একটি বস্তিতে পরিণত হতো

ড. নজরুল ইসলাম
অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কিছু দেখেছি, যা আমি বলতে চাই। আমি নকশা করি রেসিডেন্সিয়াল হাউজিং, অফিস বিল্ডিং, স্কুল। সেটা রূপান্তরিত হয়ে যায় হেলথ ক্লিনিকে, অফিস, গার্মেন্টসে তখন নকশার মূল উপাদানটা আর থাকে না। নকশাটা যে কারণে করা হয়, তার সঠিক ব্যবহার হয় না। কিন্তু আমি মনে করি, বেসিক শিল্পনগরী ইপিজেড এই দুটি যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হয় তবে শিল্পনগরী হিসেবে শহরের আবাসন যেন আশপাশে সংলগ্ন করাই বাঞ্ছনীয়। শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা এটারই একটি অঙ্গ। তাদের ট্রান্সপোর্টেশন মুড এটারই একটি অংশ।

বর্তমান বিশ্বে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। আমার তাড়া আছে, তাই বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি।

গোলাম মোর্তোজা : ধন্যবাদ। এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আরো বিস্তারিত আলোচনা করবো। এবার বক্তব্য রাখবেন ন্যাশনাল হাউজিংয়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আবদুর রব সাহেব।

আবদুর রব : হাউজিং লোন আমাদের

পরিকল্পনা আইনের উন্নয়ন প্রয়োজন। আর আইনের ক্ষেত্রে ডেভেলপমেন্টের যে সব সমস্যা দেখা যায়, সেগুলো হলো- পানি, গ্যাস, আবর্জনা, রাস্তাঘাট, ট্রাফিক ও বিদ্যুৎ

আব্দুস সালাম
প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর

দেশের একটি খুবই আলোচিত বিষয়। প্লট কিনতে গিয়ে ইন্টারেস্ট নিয়ে, লোন নিতে নানা সমস্যা দেখা দেয়। আমি যখন ঢাকায় আসছি তখন উত্তরা, ধানমন্ডি, বারিধারা সব অপরিকল্পিত ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পরে এগুলো খেয়াল করা হয়নি। আমরা, মানে ন্যাশনাল হাউজিং শহরের লোকজন যাতে সহজ শর্ত নিয়ে বাড়ি করতে পারে, সেজন্য ঋণ দিয়ে থাকে। এরপরে ১৯৯৮ সাল থেকে আমরা প্রায় ৪ হাজারের মতো অ্যাপার্টমেন্ট করার জন্য ঋণ দিয়েছি। এর মধ্যে এখন প্রায় ৫ হাজার হাউজিং রয়েছে। আমরা চেষ্টা করি, কম সুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়ার, যেন ইনস্টলমেন্ট এবং ইনভেস্টমেন্ট দুটোই কম হয়। আমাদের ন্যাশনাল হাউজিং এই কাজটা করে থাকে হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের মাধ্যমে। ফলে ইনস্টলমেন্টের চাপটা একটু লাঘব হয়। কিন্তু যেটাকে মেইনলি সুদ বলে, সেটাই আমাদের লাভ। আমরা মার্জিনের ওপর ব্যবসা করি। আমি যদি টাকা কম সুদে পাই তাহলে আমার পক্ষে কম সুদে টাকাটা দেয়া সম্ভব। আমার ৩%-২% মার্জিনের ওপর লাভ হলেই চলে। আমরা এর আগে কম সুদে টাকা দেয়া শুরু করেছিলাম। প্রায় ১২% সুদে আমরা টাকা দিতাম। কিন্তু আপনারা রিসেন্টলি জানেন যে, বর্তমানে ক্রেডিট কার্ডগুলো অনেক বেশি হয়ে গেছে। প্রায় ২২% ব্যাংক ঋণ। ডিপোজিটের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ রয়েছে ১০%। ফলে ঋণ অনেক বেশি হয়ে গেছে। সুদের হার বেড়ে গেছে। ফলে আমাদেরও সুদের পরিমাণ বাড়াতে হয়েছে। কিন্তু আমরা চেষ্টা করবো কম সুদে ঋণ দেয়ার। আমাদের এখানে মিনিমাম শেয়ারহোল্ডার হলো ব্যাংক এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। যার কারণে আমাদের একটু সুদ বাড়াতে হয়েছে। সুদের হার কমলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সব সহজে করা সম্ভব। বর্তমানে আপনারা দেখেছেন, সরকার একটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট করেছেন। আপনারা হয়তো দেখেছেন, জমির বায়নাপত্র, দলিল- সবকিছু দ্রুত রেজিস্ট্রি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের ব্যবসা করতে অনেক সমস্যা হয়েছে। কিন্তু রাজউকের ক্ষেত্রে আমাদের বলা আছে যে, আপনারা যদি ধানমন্ডি, উত্তরা ওদিকে জমির জন্য ঋণ দেন তবে রেজিস্ট্রেন্ট আওতায় ঋণ দেবেন। এখন আমাদের একটি অসুবিধা হলো মিনিস্ট্রি অব ল'তে দেখা গেল যে, ধানমন্ডিতে একজন লোক বেশ কয়েকটি জমির মালিক। কিন্তু সে আমার কাছে ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিতে এলো, আমি যেন তাকে রেজিস্ট্রেন্ট মর্যাদায় ঋণটা দিই। কিন্তু এই রেজিস্ট্রিটি নিতে হলে রাজউক থেকে অনুমতি লাগবে। কিন্তু রাজউক থেকে অনুমতিটা পাওয়া এতো সহজ নয়, যত সহজে ঋণ দরকার। কিন্তু ডেভেলপার তখন তাকে বলবে যে, আপনি কাগজ তাড়াতাড়ি জমা দিলে আপনার নামে টাকা তাড়াতাড়ি জমা হবে। কিন্তু আমার পক্ষে টাকা এতো সহজে দেয়া সম্ভব নয়। কারণ রাজউক থেকে যে অনুমতি লাগবে, সেটার মর্টগেজ দিতে গেলে তারা ঐ লোককে বলবে। আপনার এখানে ৬ তলা বাড়ি হবে কিন্তু এখানে ২০টি অ্যাপার্টমেন্ট হবে। আপনার জন্য কোন তলার মর্টগেজ দেব। ধরেন ৫ম তলার সাউথ ইস্টের ফ্ল্যাট আপনার। কিন্তু এ ফ্ল্যাটটা এখনো তৈরি হয়নি। জায়গাটা আকাশের ওপরে। এ জন্য আমি এবং ডিবিএইচ মিনিস্ট্রি অব ল'তে গিয়েছি। সরকার যদি এই রেজিস্ট্রেশনের

Born to Build
SHAH CEMENT

ব্যাপারটা নিজেই আরো সহজ করে দেয় তাহলে আমরা সহজশর্তে ঋণ দিতে পারি। না হলে ঋণ দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আগে আমরা দলিলপত্র রেখে, ইক্যুইপমেন্টের কাগজপত্র রেখে টাকা-পয়সা দিয়ে দিতাম। আপনারা যারা সাংবাদিক আছেন, তারা দেখবেন লন্ডন ইউনিভার্সিটি অব ল'-এর ক্ষেত্রে আরো সহজে ঋণ প্রদান করা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে ঋণদানের ক্ষেত্রে সমস্যা হলো কেউ যদি বলে যে, আমি টাকা দেব না এবং আমি যদি এর বিরুদ্ধে আদালতে কোনো ব্যবস্থা নিই তাহলেও কিন্তু অতি সহজে এই কাজটা সমাধা করা সম্ভব না। প্রথমে ডেট দিল, পরে আদালত আমাকে বাড়িটা বিক্রি করে দিতে বলল। কিন্তু দেখা গেল আদালতের মাধ্যমে বাড়িটা বিক্রির নির্দেশ পেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলাম, তখন কোনো লোক মর্টগেজ দিয়ে বাড়িটা কিনতে চায় না। আবার যদি আদালতকে বলা হয়, বাড়িটি কেউ কিনতে চায় না। তাহলে আদালত বলে, আপনার নামে রেজিস্ট্রেশন করে দেন। কিন্তু বাড়িটি হয়তো আমার দরকার নাই বা কোনো কাজেই আসছে না। কারণ বাড়িটি কেনার পেছনে ঋণ নেয়া হয়েছে ৩০ লাখ টাকা। মোট খরচ প্রায় ১ কোটি টাকা। দেখা যায় যে, ৫০ লাখ টাকা ঋণ দিয়ে এবং বাকি ৫০ লাখ টাকা নিয়ে আমি আদালতে কোনো মামলা করতে পারি না। কারণ আমার আগে বাড়ির শর্ত এস্টাবলিশড করতে হবে। এ আইনটা সরকারকে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যাতে যারা মালিকানা পাবে এবং মালিকানা ট্রান্সফার করবে তা যেন সহজে করা যায়। আর রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারটা মিনিস্ট্রি যদি ভালোভাবে দেখে তাহলে আমরা ভালোভাবে ঋণ দিতে পারবো। ঋণ দেয়াই তো আমাদের ব্যবসা। আর এ ব্যাপারে জনমত এক হলে আমরা ভালোভাবে কাজটা করতে পারি। ধন্যবাদ

গোলাম মোর্তোজা : আপনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ জটিল বিষয়গুলো বললেন সহজভাবে। সারা পৃথিবীতে আইন তৈরি করা হয় জনগণের স্বার্থে। কিন্তু বাংলাদেশে অনেক জটিল করে আইন তৈরি করা হয়। আমরা অনেক বছর ধরে শুনছি যে, সুদের হার কমানো হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এটা কমানো হয়নি। আপনি জনমত তৈরির কথা বললেন। কিন্তু জনমত আর কীভাবে তৈরি হবে! এবার ড. শায়েব গফুর-

ড. শায়ের গফুর : আজকের গোলটেবিলের শিরোনাম পরিকল্পিত নগরায়ণ ও আবাসন শিল্প। পরিকল্পিত নগরায়ণ বলতে কি আমরা পরিকল্পিত নগরকে বোঝাচ্ছি? আরো ভালো ঢাকার নগর পরিকল্পনাকে বোঝালে। নগর পরিকল্পনায় আবাসন শিল্প সরাসরি জড়িত, এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত পোষণ করার কথা নয়। আজকের বাস্তবতায় আবাসনের ক্ষেত্রে সবার জন্য নগরায়ণের কথা বললে দুই খাতকেই বিবেচনায় আনতে হবে। বেসরকারিভাবে আবাসন শিল্প প্রাতিষ্ঠানিক খাতে যে অবদান রাখছে সেই বিষয়টা স্পষ্ট। তবে অবজারভেশন খাতে বোধহয় এখনো তারা কাজ শুরু করেনি। নগরায়ণের ক্ষেত্রে আবাসনের সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে চারটি বিষয় সংশ্লিষ্ট। স্থাপত্য, রিয়েল এস্টেট, নগর পরিকল্পনা, আবাসস্থল শিল্প বা হাউজিং। আমরা কিছুদিন আগে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ওয়ার্কশপে এ বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করেছিলাম। এ দ্বারা বোঝায়, এ বিষয়গুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী। আমরা পাঁচটা পয়েন্ট রেখেছিলাম, যার মধ্যে এ চারটিকে উদ্দেশ্য করে।

১. স্থান-কালভেদে বিষয়টির তাত্ত্বিক লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। ২. ঢাকায় এর অনুসারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী? ৩. ঢাকায় প্রাপ্তি এবং প্রয়োগের মাঝে যদি ফারাক থাকে তবে এর কারণটা কী? ৪. পার্থক্যের ফলে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে নতুন করে কি নির্ধারিত হচ্ছে? ৫. আবাসনে Post occupancy level-এ কোনো মূল্যায়ন হয় কি না।

আমরা দেখলাম যে, এ চারটি বিষয়ে আবাসন লেভেলে তাদের নিজ নিজ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অস্পষ্ট। যখন আমরা ঢাকায় তখন তাদের কাছে বিবেচনায় আনা বা টার্মস অব এনগেইজমেন্টে সুনির্দিষ্ট ধারণার প্রয়োজন আছে। তাদের মধ্যকার সমন্বয়েরও প্রয়োজন আছে। চারটি বিষয়ের মধ্যে সমন্বয়েরও প্রয়োজন আছে। সে বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু কথা বলা যায়। প্রথমেই স্থাপত্যের কথা বলছি।

আবাসনের চেহারা ও মুনাফা শেষ কথা নয়, ভোক্তার পরিসর এবং পরিবেশগত যে চাহিদাগুলো আছে সেগুলো মেটাতে স্থাপত্যবিদ্যার সৃজনশীলতা ব্যবহার করতে হবে

ড. শায়ের গফুর
সহযোগী অধ্যাপক, স্থাপত্য বিভাগ, বুয়েট

হয়তো বিষয়গুলোর মধ্যে অনেক কিছুই বাদ থেকে যাবে। তবু আমি চেষ্টা করবো ওয়ার্কশপের সে ফাইন্ডিংসগুলো তুলে ধরার। নান্দনিক, ব্যবহারিক ও সাশ্রয়ী দিকগুলো স্থাপত্যের বিবেচনায় আনতে হবে। রোজকার জীবনযাত্রা প্রতিফলিত হতে হবে বসবাসের পরিবেশ সৃষ্টিতে। যে স্থাপত্য তৈরি হবে, তার পোস্ট ডকুমেন্ট থাকতে হবে। স্থপতির জানতে হবে যে ডিজাইন তিনি ভোক্তার ভোগের জন্য তৈরি করছেন তা ভোক্তা ভোগ করতে পারছে কি না। যদি তার থেকে কম-বেশি কোনো দিক থাকে তা থেকে তারা শিক্ষা নিতে পারবেন। তাতে যে ডিজাইনগুলো হবে সেগুলো সঠিকভাবে করতে হবে।

এরপর রিয়েল এস্টেট। রিয়েল এস্টেটকে বুঝতে হবে আবাসন প্রকল্প অন্য দশটা নির্মাণের মতো নয়। আবাসনের চেহারা ও মুনাফা শেষ কথা নয়, ভোক্তার পরিসর এবং পরিবেশগত যে চাহিদাগুলো আছে সেগুলো মেটাতে স্থাপত্যবিদ্যার সৃজনশীলতা ব্যবহার করতে হবে।

তিন নম্বর হলো নগর পরিকল্পনা বা ফাইনালি প্ল্যানিং আবাসনের প্রয়োজনে নগর পরিকল্পনা অবকাঠামো, সুবিধা ও জমির সরবরাহ করতে হবে। সকল গোষ্ঠীর চাহিদা মনে রেখে কমপেক্ট সিটির ধ্যানধারণাকে বিবেচনায় আনতে হবে। আড়াই কাঠা, তিন কাঠা, পাঁচ কাঠা জমি নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে না রেখে জনসাধারণের আবাসনের জন্য বৃহৎ প্লট হিসেবে বরাদ্দ করতে হবে। এ লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে।

চার নম্বর হল হাউজিং। নগর পরিকল্পনা নীরব থাকায় স্বল্প আয়ের আবাসন আজ স্থগিত। স্বল্প আবাসনকে ব্যক্তি উন্নয়নের বাইরে স্থায়ী ওয়াকআপ আবাসনে গরিব নগরবাসীর চাহিদা মেটানোর প্রস্তাব উত্থাপন করতে হবে। এখানে বোঝানো হচ্ছে ছয় তলা যে অ্যাপার্টমেন্টগুলো আছে সেগুলো। পরিকল্পিত নগরে আবাসন শিল্পের সঠিক বিকাশে স্থাপত্য, রিয়েল এস্টেট, নগর পরিকল্পনা, হাউজিং-এ চারটি বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা একটা প্রাথমিক শর্ত। এখানেই আমার আজকের বক্তব্য শেষ করছি।

মোর্তোজা : ধন্যবাদ ড. শায়ের গফুর আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। এবারে আমরা একজন ডেভেলপার কোম্পানির বক্তব্য শুনতে চাই।

মিজানুর রহমান : আমি মিজানুর রহমান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এলিয়েন প্রোপার্টি লিমিটেড। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, আমাদের সম্পর্কে অভিযোগ অনেক। যখন আমরা জমি

Born to Build
SHAH CEMENT

নিয়ে কাজ করি তখন দেখা যায় যে, কখনো আমরা হাউজিংয়ের জমি নিয়ে কাজ করি, কখনো রাজউকের জমি নিয়ে কাজ করি, কখনো আবার প্রাইভেট ল্যান্ডের ওপর কাজ করি। আমাদের ডেভেলপারদের মধ্যে কম্পিটিশন ছিল। থাকবে। আমাদের হাউজিংয়ের একটি প্রতিষ্ঠান আছে রিহ্যাব, যার থেকে আমাদের কিছু ধারণা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নির্দিষ্ট কিছু ল্যান্ড ডিলার আছে, যারা আমাদের কলুষিত করে ফেলে। যদিও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আমাদের একটি মনোযোগ থাকে যে, আমরা ব্যবসায় লাভ করবো, তবুও পাশাপাশি একটা সামাজিক দায়িত্ববোধ জন্মায় যে, আমরা এটাকে একটা সামাজিক সেবা বলে মনে করি। কিছু কিছু সীমাবদ্ধ জায়গা আছে যেখানে বলা আছে যে, বিল্ডিং করা যাবে না। ল্যান্ড ওনাররাও জানেন যে, এমন কিছু সরকারি জায়গা আছে, যেখানে বিল্ডিং তৈরি করা যাবে না। তারপর তারা যখন সেসব জায়গা কিনতে চায় এবং দেখা যায় যে জায়গাটা গর্ভনমেন্ট প্রপার্টি, তখন তারা আমাদের কাছে দাবি করে এবং কিনতে না পেরে আমাদের ওপর বিরক্ত হয়। আমরা পুরাতন ডেভেলপাররা হয়তো নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকি। কিন্তু নতুন যারা ডেভেলপার তারা হয়তো এই অন্যায় আবদারকে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করেন, তখন তাদের ক্ষেত্রে অভিযোগ আসে। আমাদের জমি সীমিত। কিন্তু এ ধরনের ল্যান্ড ওনারদের আবদার যদি রিহ্যাবের মতো হাউজিং সোসাইটি পূরণ করে, এটা যদি আমরা রাজউকের কাছে দিয়ে দিই, তারা যদি অনধিকার চর্চা করে, একের অধিক তলা নিজেদের জন্য বরাদ্দ চায় এবং আমরা এর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিই তবে আমরা এর সলিউশন করতে পারবো। যদিও আমি খুবই পজেটিভ মাইন্ডেড। কয়েকদিন আগে সাভারে যে গার্মেন্টস বিধ্বস্ত হলো ঐটার নির্মাণকাজ আমরা করেছি। কিন্তু আমরা যারা ডেভেলপার, আমরা অনেক টাকা ইনভেস্ট করে কাজটা করি। আমরা চিন্তা করি, কতো ভালো নকশা করে কাজটা করা যায় এবং কাজটা কতো ভালো করে শেষ করা যায়। সে ক্ষেত্রে আমরা কোয়ালিটির কথাই চিন্তা করি। অনেক নেগেটিভ সাইডের মধ্যেও কিছু পজেটিভ সাইড আছে, যেগুলো হাইলাইট করতে হবে। সাভারে একটা ১০তলা বিল্ডিং পড়ে গেল। আমাদের মতো একটি তৃতীয় বিশ্বের দেশে হাতুড়ি-বাটাল দিয়ে তারা ৯ বা ১০ তলা বিল্ডিংয়ের স্ট্রাকচার অপসারণ করলো। কিন্তু বিষয়টা নৈতিক দিকে দেখতে হবে যে, আমাদের যে সংঘবদ্ধ চেষ্টা, আমরা যে ডিজাস্টার মোকাবিলা করতে পারি তা এনকারেজ করতে হবে। আমাদের যে সহযোগী সংস্থাগুলো আছে এবং আমরা যাদের সঙ্গে ইনভলভ আছি তারা যদি সহযোগিতা করে তাহলে অবশ্যই আমরা একটি সুন্দর ঢাকা কেন, একটি সুন্দর বাংলাদেশও উপহার দিতে পারি।

গোলাম মোর্তোজা : বেশ কিছু বিষয় আপনি উল্লেখ করেছেন। এগুলো নিয়ে আরো আলোচনা হতে পারে। আবাসন শিল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। নানাভাবে গত কিছুদিন ধরে পরিবেশ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সেই আলোচনাটা বর্তমান সময়ে আরো বেড়েছে। এবারে এ নিয়ে আমরা ড. নজরুল ইসলাম স্যারের কাছ থেকে আরো কিছু শুনতে চাই।

ড. নজরুল ইসলাম : প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাই সাপ্তাহিক ২০০০ এবং শাহ্ সিমেন্ট এই দুই প্রতিষ্ঠানকে আজকের এ আলোচনার আয়োজন করার জন্য। প্রথমেই মনে পড়ছে বর্তমানে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সম্পাদক বন্ধুবর শাহাদত চৌধুরী, যিনি এক সময় বিচিত্রায় ছিলেন। তিনি এক সময় আমাদের ভূগোল বিভাগকে বললেন, যেন এই নগর পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমরা কিছু লিখি। তখন তাকে শর্ত দিলাম আমরা লিখব কিন্তু পুরো সংখ্যাটা আমাদের দিতে হবে। নগর পরিকল্পনার ওপর বিশেষ সংখ্যা ছিল সেটা। কথা ছিল ১৬ পৃষ্ঠার সংখ্যা হবে, কিন্তু আমরা ২৪ পৃষ্ঠা পেয়েছি। ৭টি প্রবন্ধ ছিল। আমি অনেক খুঁজে সংখ্যাটা বের করেছি। আমার মনে হয়, ১৯৭৩-এর আগের পরিপ্রেক্ষিতে এটা একটা বিশাল পরিবেশ আন্দোলন ছিল। বিশেষ আয়োজন ছিল ঢাকা ও বাংলাদেশের নগরায়ণ নিয়ে। আমি খুলে দেখলাম একটা প্রবন্ধ ছিল হাউজিং নিয়ে। ঢাকার লোকসংখ্যা বেড়েছে ৫ গুণ।

আরেকটা প্রবন্ধ ছিল ঢাকা শহরের জমির দাম, ল্যান্ড ভ্যালুর ওপরে। একটি তথ্য ছিল, ১৯৬২ সালে ঢাকার মূল্য ছিল ২৫০ কোটি টাকা, ১৯৭২ সালে ৬৫০ কোটি টাকা, আজকে ২০০৫ সালে এটা হবে ৩০ হাজার কোটি টাকা বা অনেক অনেক বেশি অর্থাৎ এখন দাম বহুগুণে বেড়ে গেছে। আরেকটা নিবন্ধ ছিল এখানে, সেটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের বাসস্থান নিয়ে। আমি তরুণ স্থপতি তানভীর আহমেদ এবং জব্বার হোসেনকে তাদের বক্তব্যের ক্ষেত্রে কিছু ভুল আছে তা সংশোধন করে দিতে চাই। যেমন- প্রথম পাতায়, ঢাকার নগরায়ণ ও বিভিন্ন সমস্যা। ১৯১৭ সালে ঢাকার জন্য প্যাট্রিক একটি মাস্টারপ্ল্যান করেন। ঠিক আছে। কিন্তু এটা খুব বিস্তারিত ছিল না। কিন্তু বাস্তবায়ন হয়নি। এরপর ওনারা চলে গেছেন '৭৩ থেকে ২০০২-এ প্রথম পঞ্চবার্ষিক ৫টি পরিকল্পনা। কিন্তু এটা ছিল জাতীয়ভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। তার মধ্যে ফিজিক্যাল প্ল্যানিং একটুখানি ছিল। কিন্তু তা নগর পরিকল্পনা নয়। এরপরই তারা চলে এসেছেন সর্বশেষ পরিকল্পনা ডিএমডিপি ১৯৯৫-২০০৫। কিন্তু ওনারা ভুলে গেছেন সবচেয়ে বড় পরিকল্পনা ১৯৫৯ সালের মহাপরিকল্পনা। এ পরিকল্পনার জন্যই ঢাকা শহর একটি শহর, না হলে অনেক আগেই সাংঘাতিক একটি বস্তিতে

যাদের মূলত আবাসন সমস্যার সমাধান করা দরকার আমরা সেটা পারছি না। আমাদের কম মূল্যে জমি দরকার এবং বিশাল ফাইন্যান্স দরকার। ফাইন্যান্সটা এটার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত

নসরুল হামিদ বিপু
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হামিদ রিয়েল স্টেট

যতদিন পর্যন্ত এ দেশে সচেতন মানুষের চাপ প্রয়োগকারী গোষ্ঠীটি তৈরি না হবে, ততদিন পর্যন্ত কোনো সমস্যারই সমাধান হবে না। প্রচুর গবেষণাপত্র লেখা হবে, প্রচুর সেমিনার হবে, কিন্তু বাস্তবিক কোনো কাজে লাগবে না

এনামুল করিম নির্ঝর
স্থপতি

Born to Build
SHAH CEMENT

পরিণত হতো। এ মহাপরিকল্পনার ভিত্তিতে ঢাকার যাবতীয় শহর গড়ে উঠেছে। এরপর আশির দশকেও গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শহর। কিন্তু মূল শহরের যে স্ট্রাকচার তা ১৯৫৯ সালের পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এ পরিকল্পনার মধ্যে যে বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছিল, তা তারা কিছুটা আলোচনা করেছেন যে, এলাকাভিত্তিক ব্যবহারের নিশ্চয়তাদান। যার মাধ্যমে মতিঝিল হয়ে গেল বাণিজ্যিক এরিয়া, ধানমন্ডি, গুলশান, বনানী, উত্তরা হয়ে গেল আবাসিক এলাকা, কারওয়ান বাজার হয়ে গেল বাণিজ্যিক এলাকা। তেজগাঁও শিল্প এলাকা। সনাতনী মাস্টারপ্ল্যান পদ্ধতিতে এগুলো করা হয়। ওটা আবার একটু বাড়াবাড়িও ছিল। যেমন ধানমন্ডি রেসিডেন্সিয়াল এলাকার মধ্যে একটি কর্নার শপও হতে পারবে না। ড্রাগ স্টোরও হতে পারবে না। এটা তো হয় না। কিছু তো থাকতে হয়। সুযোগ ছিল কেবল ২-৩টি স্কুল। ২-৩টি খেলার মাঠ এবং মসজিদ। পরবর্তীতে এটা পরিবর্তিত হয়ে। বেশি বেশি সুপার শপ হয়ে যায়। একটি সমতা থাকা উচিত। যাই হোক, সত্তরের পরে, স্বাধীনতার পরে ঢাকার পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায়। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বরে পর ঢাকার লোকসংখ্যা ছিল ৭-৮ লাখ বা ধরুন ১০ লাখই। কিন্তু বর্তমানে এ জনসংখ্যা প্রায় ১১২ লাখ। ১২ মিলিয়ন। অর্থাৎ ১ মিলিয়ন থেকে ৩৫ বছরে ১২ মিলিয়ন। ১২০০% বেশি। পৃথিবীতে আর কোনো বড় শহরে এমনটা হয়নি। এর সঙ্গে তাল মেলানো খুবই শক্ত কাজ। নিবন্ধের দ্বিতীয় পাতায় ওনারা লিখেছেন, জনসংখ্যার দিক দিয়ে ঢাকার অবস্থান দশম বা নবম হতে পারে। প্রতি বছরে এ শহরের জনসংখ্যা ৫৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। এটা বোধহয় ছাপার ভুল। ৫.৩% হবে। এই যে ৫.৩%, এটা ৫% হলে সেটাও সাংঘাতিক। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এখন ৫.৬%, বা ৫.৭% বা ৫.৫% হারে। সেখানে যদি ঢাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৫% হারে। অর্থাৎ প্রায় ৭০.৫ ভাগ হারে বাড়ছে। অর্থাৎ ৭০৫, অর্থাৎ এটা ১৪ বছরে আরো ডবল হয়ে যাবে। আমাদের একটি হিসাব আছে তাহলো, আগামী বছরে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা আরো ২৫ মিলিয়ন থেকে ৩০ মিলিয়ন হতে পারে। এমনকি ৩৫ মিলিয়ন বা ৩.৫% কোটি হতে পারে। তখন অবশ্য ঢাকা শহর অনেক বিশাল এখন বৃহত্তর ঢাকা মানে এটা রাজউকের সীমানা। ১৫০০ বর্গকিলোমিটার। তখন এই শহর হবে নারায়ণগঞ্জ থেকে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত ৩৫০০ বর্গ কি.মি. এবং লোকসংখ্যা হবে আরো ৩ কোটি। এবং ঢাকা তখন হবে জনসংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর। বোধ হয় এটা হতে পারে। যেভাবে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে এটা হওয়াই স্বাভাবিক। আবাসিক এলাকাই আমাদের আজকের টপিক। ড. গফুর বলেছেন এবং আমরাও সবাই জানি আবাসিক এলাকাই এখন আমাদের সবচেয়ে বড় এলাকা। যেকোনো শহরেই

বিশ্বব্যাংক '৯০-এর শুরুর দিকে একটা নতুন ধারণা দেবার চেষ্টা করছে। সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত ও সরকারি যৌথ অংশীদারিত্ব। এটা অনেক বেশি কাজ করেছে

ড. মুনাজ আহমেদ
সহযোগী অধ্যাপক, পুরোকৌশল বিভাগ, বুয়েট

শতভাগ জমির ৬০ ভাগ আবাসিক কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। শহরের বেলায় দেখেন, এই আবাসনের ব্যবস্থাটা কারা করেন। শিল্প মানে হলো একটি বড়-সড়, আপনারা যাকে বলেন অর্গানাইজড। আমি ইউনিভার্সিটির কোয়ার্টারে থাকি, যেটা সরকারি আবার আধাসরকারি। ড. গফুর যে কোয়ার্টারে থাকেন তা আধাসরকারি। এটা আবার পাবলিক সেক্টর। আজিমপুর কলোনি, মতিঝিল কলোনি এগুলো পাবলিক সেক্টর। এই পাবলিক সেক্টরে ইতিমধ্যে ৫০ বছর পাকিস্তান আমল, বাংলাদেশ আমল মিলিয়ে প্রায় ১-২ লাখ ইউনিট বাড়িঘর করেছে। এরপর এল ফরমাল প্রাইভেট সেক্টর, যেটাকে বলা হচ্ছে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি। এদের অভ্যুদয় কবে? প্রধানত আশির দশকে। জহরুল ইসলাম সাহেব হলেন এর উদ্যোক্তা। পাইওনিয়র অনেক কিছুই তিনি পারফর্ম করেছেন। তিনিই প্রথম করেছেন পল্লবী হাউজিং কোম্পানি। ল্যান্ড রেসিডেনসিয়াল সিঙ্গেল ফ্যামিলি ইউনিট- চমৎকার উদাহরণ প্রাইভেট সেক্টরের। তারপর এল আপনাদের মাল্টি স্টোরেড হাউজিং। এখানে আপনারা কত করেছেন ঢাকা শহরে? প্রায় ৬০-৭০ হাজার ইউনিট হবে। বড়জোর ১ লাখ প্রাইভেট সেক্টরের কর বাড়ল। লোকসংখ্যা হলো ১১২ লাখ। ১১২ লাখকে ৬ দিয়ে ভাগ করলে ২০ লাখ হাউজিং ইউনিট পাওয়া যায়। ২০ লাখের মধ্যে আপনারা করেছেন ১ লাখ। অর্থাৎ ২০ ভাগের ১ ভাগ। অর্থাৎ আপনারা করেছেন ৪%। ৪% ঢাকার City is devided by normal private sector. সরকার করেছে না হয় ৪%। বাড়িয়ে বললে ১০%। বাকি ৭০% তাহলে কে করল, আবাসন কে দিল? কৃতিত্বটা তাহলে কার? সবচেয়ে বড় হলো প্রাইভেট হাউজ হোল্ড সেকশন। আমাদের কমপক্ষে ৩৫ লাখ লোক স্লামে থাকে, এই স্ল্যামের আবাসন কে করে? আবাসন শিল্প মানে এটাকেই তো বোঝায়, এটা ইনফর্মাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর বিশাল। সেখানে ওটার উদ্যোক্ত হচ্ছে স্ল্যাম লর্ড, স্ল্যামের মালিক বা জমির মালিক। তিনি সাধারণত ঝুপড়ি-ঝাপড়ি বা টিনের ঘর ইত্যাদি ধরনের বাড়ি করেন। শাহ্ সিমেন্ট আজকে এটার উদ্যোক্ত, এটা ভালো। আমি স্ল্যামেও ঘোরাফেরা করি। এখন স্ল্যামের লোক আপনারা দেখবেন কি করে স্ল্যাম কিন্তু উন্নত হচ্ছে চুপচাপ। ঐ ঝুপড়ি-ঝাপড়ি কমে যাচ্ছে।

আমি জাতীয় গৃহায়ণ নীতিমালা প্রণয়নের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলাম। প্রত্যেকটাতে আমরা বারবার বলেছি, যেটা আপনারদের দাবিও ছিল, সরকারের ভূমিকা হবে ব্যক্তিগত খাতগুলোকে সাহায্য- সহযোগিতা করা। কীভাবে করবেন? দুটো উপায়ে করবেন: (১) সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করে, (২) রেজিস্ট্রেশনের নিয়মনীতি সহজ করে করবেন। এটা না করলে তো হবে না। সরকারের এটা বড় ভূমিকা।

সরকার যদি রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারটা নিজেই আরো সহজ করে দেয় তাহলে আমরা সহজশর্তে ঋণ দিতে পারি। না হলে ঋণ দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না

আব্দুর রব
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ন্যাশনাল হাউজিং ফিন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট লি:

Born to Build
SHAH CEMENT

সরকারকে কে বলেছে বাড়ি বানাতে? স্বাধীনতার পরপর দরকার ছিল। কিন্তু এখন দরকার নেই। এখন রিয়েল এস্টেট পেশা ও ব্যবসা সত্যিকারার্থেই উন্নত হয়েছে। তাদের এসোসিয়েশন আছে, তারা বোধ হয় এরপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন যেমন- ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ। তারা নির্মাণসামগ্রী তৈরি করবার জন্য এগিয়ে আসছেন। এই যে শাহ্ সিমেন্ট আজ এগিয়ে এসেছে, কী দরকার ছিল এতো কিছুর? তার মানে এটা সামাজিক দায়বদ্ধতা যে আমি পাকা ঘরে গরিব মানুষকে রাখব। কেন রাখব না, এটাই তো আমার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই যে সালাম সাহেব বললেন, পাকিস্তান আমলে চমৎকার সব উদাহরণ আছে। মাস্টারপ্ল্যান ছিল ধানমন্ডি বড়লোকদের জন্য, লালমাটিয়া উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মোহাম্মদপুর মধ্যবিত্ত, মিরপুর গরিবদের জন্য। চমৎকার একেকটা পরিকল্পনা। আরও দেখেন, যদিও বলতে খারাপ লাগে যে পাকিস্তান করেছিল, আমরা কেন করিনি। সেটা হচ্ছে শিল্প এলাকা আলাদা ছিল। শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের আবাসন ব্যবস্থা ছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাটকল আদমজি। ৩০ হাজার শ্রমিকের অধিকাংশই কারখানার সঙ্গে থাকত। কিন্তু দেখেন আজকে গার্মেন্টসের শ্রমিকদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা নেই। অবশ্য এই গার্মেন্টস দিয়েই নাকি দেশ চলে। চলতে পারে। কিন্তু ওদের কী অবস্থা, মানবেতর পর্যায়ে তারা বাস করে। তাদের কি কোনো দায়-দায়িত্ব নেই, কোনো নৈতিক দায়বদ্ধতা নেই? আমাদের সুপারিশে যেটা আছে, সরকার আইন করে যারা শিল্পক্ষেত্রে আছেন তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করতে পারে। যেটা কখনোই বাস্তবায়িত হয়নি বা হবার উদ্যোগও নেই। যেটা মালয়েশিয়ায় আছে, ইন্দোনেশিয়ায় আছে, সেটা হচ্ছে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো উচ্চ-মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তের জন্য বাড়ি করবে এবং ১০টা বাড়ি করলে তাকে ঐ লাভ থেকে ২/৩টা বাড়ি গরিব বা নিম্নবিত্তের জন্য করে দিতে হবে, একটু কষ্ট একটু সাবসিডি করে। দরকার হলে সরকার তাদের জন্য জমি দেবে। আমার মনে হয় আপনাদের উদ্যোগটা ভালো। আমি জানি ডেভেলপারদের মধ্যে যারা সাংঘাতিক ধরনের সমাজ সচেতন, পরিবেশ সচেতন এবং শ্রেণী সচেতন তারা এগিয়ে আসবেন এবং এটা করা সম্ভব। এই সিভিল সোসাইটির সঙ্গে একটু থাকুন। স্যার আছেন, তিনি বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের সভাপতি, আমি অন্যতম সহসভাপতি। আমরা পরিবেশের দিকটা খেয়াল করব। আমরা নানা কমিটিতে আছি। দয়া করে পরিবেশ ধ্বংস করবেন না। এই কোনো কোনো মডেল টাউনের দেখেন না কেইস হচ্ছে। সর্বনাশ হয়ে যাবে একটা। ইতিমধ্যে হয়ে গেছে, আরও যাবে। কালকে মুম্বাইতে দেখেছেন কি হয়েছে? রাতেরবেলা আমি একটা সংলাপ শুনলাম। সেখানে আছেন একজন পরিবেশবিদ। একটা নদীর মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, পানি বেরুতে পারে না। আরেকটা বিশাল নিচু জায়গা তারা বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে পানি বেরুতে পারে না। মুম্বাই এতো সুপরিকল্পিত শহর হওয়া সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এই যে অমুক রিয়েল এস্টেট কোম্পানির অমুক মডেল টাউন, এটা-সেটা; এরা এই শহর, মহানগর, এই রাজধানীকে একেবারে ধ্বংসের সীমায় নিয়ে যাচ্ছে। অতএব সরকার এবং আপনাদের সচেতন হতে হবে। আমাদের যেসব সামাজিক সংগঠন আছে, নাগরিক সমাজ ও মিডিয়া আছে। আমাদের ভাগ্য ভালো যে মিডিয়া সত্য কথা বলার চেষ্টা করে। সেটা চালিয়ে যান। তাহলেই রক্ষা। তা না হলে আমরা সব শেষ হয়ে যাবো। ধন্যবাদ।

গোলাম মোর্তোজা : ধন্যবাদ স্যার। অত্যন্ত চমৎকারভাবে তথ্যসহ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ স্যার। আমরা স্যারের কাছে পরে যাবো। স্যার যদি অনুমতি দেন তাহলে এখানে অন্য যারা উপস্থিত আছেন তাদের আগে বক্তৃতা করার সুযোগ দিতে চাই। আমাদের মধ্যবিত্তদের একটা স্বপ্ন ছিল ছোট্ট একটা বাড়ি হবে। সেই বাড়ির স্বপ্ন থেকে অনেক আগেই আমরা সরে এসেছি। এখন আমরা একটা অ্যাপার্টমেন্টের স্বপ্ন দেখছি। নানা রকম প্রতিকূলতার কারণে সেই অ্যাপার্টমেন্টের স্বপ্নও সম্ভবত মধ্যবিত্তের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবার একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে। রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোকে নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এই বিষয়গুলো নিয়ে ডেভেলপার কোম্পানি থেকে যারা এসেছেন তাদের কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে চাইব। তবে এখন আমি স্থপতি এনামুল করিম নির্ঝরকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব।

এনামুল করিম নির্ঝর : আমি প্রথমেই যেটা বলব সেটা হচ্ছে, এই উদ্যোগটা অবশ্যই অত্যন্ত ভালো। এবং এটা যদি চলতে থাকে তাহলে আমার মনে হয় সেটা খুব কাজে লাগবে এবং সেই কাজটা খুব পরিষ্কার হওয়া উচিত। আমার গোলটেবিলের ব্যাপারে একটা প্রচন্ড অনীহা আছে এবং সত্যিকার অর্থে আজকে এটা আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। আমাদের দেশে এ ধরনের প্রচুর কথাবার্তা হয়, আলাপ হয় কিন্তু সেগুলো কতটুকু ফলপ্রসূ হয় সেটা নিয়ে আমার প্রশ্ন আছে। একটু আগে নজরুল ইসলাম সাহেব একটা কথা বললেন যে, পাকিস্তান আমলে হলেও বাংলাদেশে হয়নি। কেন হয়নি? এটা কিন্তু একটা মৌলিক প্রশ্ন। এই না হওয়ার কারণটা যদি জানতে না পারি তাহলে আজকে যতই কথা বলি, কোনো লাভ হবে না। আমি একেবারে মৌলিক বিষয় নিয়ে কথা বলব। কারণ আমি স্থপতি হিসেবে কাজ করছি। পেশাগত কাজ করতে গিয়ে অর্জিত কিছু অভিজ্ঞতার আলোকে আমি বলব। আমার কাছে যেটা মনে হয় যে মূল সমস্যাটা হচ্ছে সচেতনতার সমস্যা। আর সচেতনতার সমস্যাটা হচ্ছে শিক্ষার জায়গায়। আমাদের পরিবার থেকে যখন বড় হয়ে উঠছি আমরা, যখন একটা পরিবারের বাবা মারা যান বা মুমূর্ষু অবস্থায় থাকেন, তখন কিন্তু তার সন্তানেরা সবাই পাগল হয়ে যায় তার সম্পত্তি ভাগাভাগির জন্য। এখান থেকেই কিন্তু আমি মনে করি একটা গন্ডগোলের শুরু। এটাকে যদি আমরা রাজনৈতিক বা অন্য কোনোভাবে চিন্তা করি, সব জায়গাতেই কিন্তু আমাদের আসল সংকটটা হচ্ছে ভাগাভাগি নিয়ে এবং সেটা যদি নিজেরা নিয়ন্ত্রণ না করি তাহলে আসলে কোনো কিছু হবে না।

একটা সময় ছিল যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম। আমার মনে আছে এখনো পরিষ্কার। একদম প্রথম দিকে আমাদের কিছু শিক্ষক ছিলেন। আমার বাবাও শিক্ষক ছিলেন। তাই শিক্ষকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেই বলছি, তারা বলতেন যে বিদেশে যাবার জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে শিক্ষক হওয়া এবং আমার মনে আছে যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় যেতাম। একবার শাঁখারীবাজারে গেলাম। আমাদের এক শিক্ষক একটা ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলেন যে শাঁখারীবাজারের সমস্যার সমাধান কী হওয়া উচিত। আমরা স্যারকে

Born to Build
SHAH CEMENT

অনুরোধ করেছিলাম যে আমাদের সমাধানগুলো ঐ এলাকার লোকদের দেখাতে পারি কি না। কিন্তু পরে সেটা আর হয়নি। এই শিক্ষকেরা স্বভাবতই বিভিন্ন সংস্থার উপদেষ্টা হন, সরকারের বড় বড় জায়গায় যান। তারা অনেক বড় বড় কথা বলেন। কিন্তু তারা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কিন্তু শেখান না যে সচেতনতাটা কী জিনিস। কীভাবে তারা নিজেকে এবং দেশকে রক্ষা করবে বা সমাজকে কীভাবে দেখবে। এটা একটা মৌলিক প্রশ্ন। আমি আজকে আরো একটা উদাহরণ দিতে চাই যে, ধানমন্ডির কথা হচ্ছে বারবার। আমরা জানি

> ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আমাদের একটি মনোযোগ থাকে যে, আমরা ব্যবসায় লাভ করবো, তবুও পাশাপাশি একটা সামাজিক দায়িত্ববোধ জন্মায় যে, আমরা এটাকে একটা সামাজিক সেবা বলে মনে করি
>
> **মিজানুর রহমান**
> ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এলিয়েন প্রপার্টিজ

ধানমন্ডিতে কিন্তু ২১-২২টা বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এখানে কারা পড়ান? এসব শিক্ষকেরাই তো পড়ান। আমি যেটা মনে করি, বাংলাদেশের সর্বনাশের যে কয়টা মূল কারণ আছে তার মধ্যে শিক্ষকরা অন্যতম দায়ী বলে আমার মনে হয়। আজকে খুব হতাশভাবে মনে হয় যে, আমি কাউকে শ্রদ্ধা করতে পারি না। আমার মধ্যে সেই শ্রদ্ধাবোধটা জাগে না। এটা কিন্তু একটা বিরাট বড় কষ্ট দিচ্ছে। কারণ আমি যতই দায়িত্ববান হবার কথা বলি, আজকে শায়ের গফুর সাহেব দায়িত্ববান হবার কথা বললেন, উন্নত ভবন তৈরির কথা বললেন, খুব ভালো কথা। সেটা কখন আসবে? আমার কিন্তু একটা উৎসাহ লাগবে। এখন দেখা যায় যে, আমি দু-একটা উদাহরণ দেব, যেমন চট্টগ্রামে আমি একটা শপিং কমপ্লেক্স করলাম। সেটা করতে গিয়ে দেখা গেল যিনি ঐ রিয়েল এস্টেট কোম্পানির এমডি, উনি আমেরিকার খুব ভালো জায়গায় লেখাপড়া করেছেন। শেষ সময়ে এসে যখন দেখলেন যে নিচতলায় দোকান খুব বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। তখন নিচতলায় যে টয়লেট ছিল, ওটাকেও উনি একটা দোকান বানিয়ে ফেললেন এবং গেটম্যানের জায়গাটাতে উনি দরজা বানিয়ে ফেললেন। তার কথার ওপর আমি অবশ্যই জোর দেবো। কারণ তাকে আমি দোষ দিতেও পারছি না। কারণ আমি যদি না করি তাহলে তিনি আরেকজন স্থপতির কাছে যাচ্ছেন এবং সেই স্থপতি কাজটা করে দিচ্ছেন। এ রকম কিন্তু অনেক মানুষ আছে। আমরা এখন যদি মূল জায়গায় আসি যে, কীভাবে আমরা সেই শিক্ষাটাকে নিশ্চিত করবো। ঠিক আছে, আমরা এই দেশে যদি বাস করতেই চাই, সোনার দেশ গড়তেই চাই, তাহলে কী দিতে হবে? সেই জায়গাটার জন্য আসলে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একটা নির্ভুল আয়না। কারণ আমাদের নিজেদের চেহারাটা দেখা দরকার, যেটা আমার কাছে অনেক বেশি জরুরি কাজ বলে মনে হয়। কারণ এখানে ডেভেলপারদের মধ্যে একজন যিনি তার সীমাবদ্ধতার কথা বললেন, তার ভালো ইচ্ছার কথা বললেন, সবার নিরাপত্তার কথা বললেন। এজন্য কিছু নীতিমালা দরকার। এই নীতিমালাগুলো কে করবে? সেটার জন্য রিহ্যাব হয়েছে। রিহ্যাব যদি আজকে ঠিক করে দেয় এক বছরের অভিজ্ঞতা বা কি ধরনের প্রকৌশলীদের মাধ্যমে এসব বিল্ডিংয়ের নকশা করবে, তাহলে কিন্তু সমস্যাটার সমাধান হয়ে যায়। যার সচেতনতা আছে, যার দায়বদ্ধতা আছে এবং যার ইচ্ছে আছে তাকে কিন্তু যেকোনো উপায়ে সবাই উপেক্ষা করছে; যে সরকারই হোক আর ডেভেলপারই হোক। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন যারা আছেন যেমন আমি যদি মাজহারুল ইসলাম সাহেবের কথা বলি, বশিরুল হক স্যারের কথা বলি, ওনারা চমৎকার অ্যাপার্টমেন্ট ডিজাইনিস্ট। কাজেই তারা কিন্তু প্রচন্ড হতাশ এবং এরপর উত্তমদা যিনি এক সময় চমৎকার কাজ করতেন, তিনিও হতাশ হয়ে গেছেন। যখন তার ভালো কাজ করার সময়টা চলে আসে, যখন তিনি ভালো মতো অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তখন তাকে একেবারে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়। কারণটি হচ্ছে উনি সত্যি কথা বলেন। এখন এমন বিষয় যদি আসে, আমি আমার কথাই বলি। আমার সর্বশেষ একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। একজন ডেভেলপার এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনি কি রাজউকের নিয়ম মানেন? আমি বললাম, অবশ্যই মানি। তখন উনি বললেন যে, তাহলে তো আমি বোধ হয় পারবো না। কারণ হচ্ছে, যিনি জমির মালিক উনি বলে দিয়েছেন। উনি যে কথাটা বললেন, যদি আজকে ডেভেলপারদের সংগঠন রিহ্যাব মনে করে যে আমাদের এই রকম ব্যবস্থা থাকবে, নীতিমালা থাকবে, কোনো রিয়েল এস্টেট কোম্পানিকে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে, এ ধরনের এডি যেটা আছে তাদের সঙ্গে একটা সমন্বয় থাকবে এবং প্রাথমিক স্তরে যারা কাজ করে, তাদের সঙ্গে একটা সমন্বয় থাকবে, এ সমন্বয়টা থাকলে তখন তারা একটা চাপ প্রয়োগকারী গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করবে বলে আমার মনে হয়। আমি মনে করি যতদিন পর্যন্ত এ দেশে সচেতন মানুষের চাপ প্রয়োগকারী গোষ্ঠীটি তৈরি না হবে, ততদিন পর্যন্ত কোনো সমস্যারই সমাধান হবে না। প্রচুর গবেষণাপত্র লেখা হবে, প্রচুর সেমিনার হবে, কিন্তু বাস্তবিক কোনো কাজে লাগবে না। আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করবো না। আমার যেটা মনে হয় আপনাদের সবাই যেটা দেখবেন যে একটা মোবাইল কোর্ট বের হয়েছে, যারা বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে যায়। এটা যদি সবসময় চলতে থাকে এবং হয়রানিমূলক না হয় তাহলে খুবই ভালো কথা। স্যার একটা কথা বলেছেন যে আমাদের দেশে ডেভেলপারদের বাইরেও একটা গ্রুপ আছে যারা নিজেরাই নিজেদের বাড়ি বানাচ্ছে। তারা কিন্তু বড় সর্বনাশের মূল। এ রকম যদি হয় যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো যদি কিছু করে, তারাইবা কেন করবে? এখানে একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে যারা সত্যিকারের জ্ঞানি, গুণী এবং দায়িত্ববান তাদেরকে একটা চাপ প্রয়োগকারী গোষ্ঠী হিসেবে নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে আসতে হবে। তাদেরকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। হয়তো লাভ হবে না। বলতেই হবে মোর্তোজা ভাইরা যদি এ ধরনের আয়োজন চালিয়ে যেতে থাকেন এবং এ সংক্রান্ত যে কাজগুলো হবে সেটা শুধু প্রকাশ করাই না, সেটা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে যেতে পারে, রিহ্যাবে যেতে পারে, আইএবি-তে যেতে পারে, বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারে। তারা হয়তো পড়ে দেখবে না আজকে, কিন্তু যখন দরকার হবে তখন তো নিশ্চয়ই পড়ে দেখবে। সবাইকে ধন্যবাদ।

গোলাম মোর্তোজা : আসলে তারা যদি এ কথাগুলো শুনতেন, এ জিনিসগুলো পড়ে দেখতেন এবং চিন্তা করতেন তাহলে বাংলাদেশের চেহারার আরো অনেকখানি পরিবর্তন হয়ে যেত। '৭৩ সালের বিচিত্রায় স্যাররা যে প্ল্যানগুলো লিখেছিলেন তার যদি কিছু অংশও বাস্তবায়ন করা যেত, তাহলে হয়তো বাংলাদেশের বা ঢাকা শহরের এ সমস্যা নিয়ে আজকে আমরা যে আলোচনা করছি, নির্ঝর ভাই হতাশার আলোচনা করলেন, সে রকম আলোচনা হয়তো করতে হতো না। আমরা ড. মুনাজ আহমেদ, বুয়েটের শিক্ষক, তার কথা শুনবো।

ড. মুনাজ আহমেদ : আমি প্রথমেই শাহ্

Born to Build
SHAH CEMENT

সিমেন্ট ও সাপ্তাহিক ২০০০ কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এ রকম একটা গোলটেবিল আয়োজন করার জন্য। আমার বিশেষত্ব আসলে ভূমিকম্প নিরোধক বিল্ডিংয়ের নকশা তৈরি এবং বিল্ডিং তৈরির উপকরণ সম্পর্কিত কাজ করা। আমি এখানে কিছু কথা বলতে চাই এবং অনেক জায়গায় বলার চেষ্টা করি যেগুলো অনেকের কথার মাধ্যমে চলে এসেছে। প্রথম যে কথাটা আমি বলতে চাই যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল হাউজিং, ব্র্যাক, ডেল্টা, ব্যাংক এরা যারা গৃহায়ণ করছেন, আমাদের এখানে দুই ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। একটা হচ্ছে ব্যক্তিগত খাত, আরেকটা সরকারি খাত। তারা আলাদাভাবে কাজ করছে। কিন্তু বিশ্বব্যাংক '৯০-এর শুরুর দিকে একটা নতুন ধারণা দেবার চেষ্টা করছে। সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত ও সরকারি যৌথ অংশীদারিত্ব। এটা অনেক বেশি কাজ করেছে। উন্নত বিশ্বে সবচেয়ে বেশি কাজ করছে পানীয় জল খাতে। যেটা মানুষের মৌলিক চাহিদা। আমরা মনে করি পানি আমরা ফ্রি পাবো কিন্তু সে রকম একটা খাতেও সরকারি ও ব্যক্তিগত যৌথ অংশীদারিত্ব নিয়ে এসেছে। ব্যক্তিগত খাত বিনিয়োগ করছে। আমাদের এখানে যে জিনিসটার অভাব আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত খাত একা কাজ করছে, সরকারি খাত তাদের হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের মাধ্যমে ঋণ দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা একসঙ্গে কাজ করছে না। যৌথ অংশীদারিত্ব যদি করা যেত সরকারি এবং ব্যক্তিগত খাতের মধ্যে, যেখানে রিব শেয়ারিং, ব্রিফ শেয়ারিং এবং রেসপনসিবিলিটি শেয়ারিংয়ের একটা ব্যাপার থাকে তাহলে ভালো হতো। ধন্যবাদ।

গোলাম মোর্তোজা : এবার প্ল্যানার তারেকুজ্জামান বলবেন কিছু।

শরীফ মোঃ তারেকুজ্জামান : আমরা আজকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। পরিকল্পিত নগরায়ণ ও আবাসন শিল্প। প্রথমেই আসে নগরায়ণ বা নগর এলাকার কথা। নগর এবং শহর তুলনামূলকভাবে আলাদা। নগরে আলাদা রাস্তা, শিল্প এলাকা, বাণিজ্যিক এলাকা থাকবে। যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকবে। এগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক থাকলেই নগরায়ণটা গড়ে ওঠে। কতগুলো শহরের সমষ্টি হলো নগর। সময় স্বল্পতার কারণে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মোর্তোজা : আসলে আবাসন শিল্প নিয়ে যারা বড় বড় কাজ করছেন তারা প্রত্যেকেই প্রতি মুহূর্তে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে যেমন, তারা যে হাউজিং প্রকল্পের আওতায় বাড়ি বানাবে তা নিম্নমানের কি না বা উন্নত কি না। ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রেও তারা সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলো আছে সেগুলো কোনোভাবে সাহায্য করতে পারে কি না তা আমরা আপনাদের কাছে জানতে চাই। হামিদ রিয়েল এস্টেটের এমডি নসরুল হামিদ বিপু'র থেকে বিস্তারিত জানতে চাইবো।

নসরুল হামিদ বিপু : আজকের গোলটেবিল আলোচনার বিষয়বস্তু হলো পরিকল্পিত নগরায়ণ ও আবাসন শিল্প। আমাদের এ নিয়ে কথা বলতে হলে আরও পেছনের দিকে যেতে হবে। ষাটের দশকে আমাদের দেশে বা পাকিস্তানে আবাসন শিল্প প্রথম প্রাইভেট সেক্টরের আওতায় শুরু হয়েছে। আশির দশকের শেষের দিকে, নব্বইয়ের শুরুতে আমরা বাংলাদেশের ৬-৭টি কোম্পানি সবাই মিলে হাউজিং প্রকল্পের একটা প্রতিষ্ঠান চালু করি। নাম রিহ্যাব রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড রিহ্যাবিলিয়েটেশন। যখন প্রথম এটা শুরু করি তখন ধারণা ছিল এ ব্যবসায় আমরা সফল হব না। মানুষ চায় সামনে বাগানসমৃদ্ধ সাজানো-গোছানো বাড়ি। তাই এই হাউজিং প্রকল্পের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হবে কি না তা নিয়ে আমাদের সন্দেহ ছিল। প্রথমদিকে রিহ্যাবের সদস্য ছিল ১২-১৪ জন। নব্বইয়ের পরে এর সদস্য সংখ্যা বেড়ে ৬৬-তে দাঁড়ালো। আমাদের লক্ষ্য ছিল হাউজিং প্রকল্পের মাধ্যমে যে ঋণ দেওয়া হবে, যে কাজগুলো হবে তা যেন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে করা হয়। অর্থাৎ জমি যেন অবশ্যই রেজিস্ট্রি করা হয়। আমাদের ডেভেলপারদের এক হতে হবে। কেননা, ডেভেলপারের সংখ্যা বাংলাদেশে ১%। আমাদের দেশে লোনের হার অত্যন্ত বেশি।

সবাই কেন ঢাকাকেন্দ্রিক কথা বলি? আমরা কেন ঢাকাকেন্দ্রিক সমস্যার সমাধান করি? কেন বাংলাদেশব্যাপী করতে চাই না? যুক্তির কথা আমরা শুনি কিন্তু কেন আমরা বাইরে করতে চাই না? সেগুলো পরবর্তীতে আলোচনায় আসা উচিত। আমি কিছুদিন আগে সিলেট গিয়েছিলাম। সিলেটের অবস্থা আরও খারাপ। অপরিকল্পিতভাবে যেখানে-সেখানে মার্কেট হচ্ছে। এটা তো কেবল সিলেটের প্রসঙ্গ না। চট্টগ্রামের অবস্থা দেখেন, এখন পর্যন্ত সেখানে আমরা ঢুকিনি। আমাদের একটু খাওয়াতে পারলে, কারণ আমরা উন্নয়নের একটা অংশ। আমরা চাই ব্যবসা, আমরা চাই উন্নয়ন। স্বাভাবিকভাবেই সবার আগে আসবে ব্যবসা। আর অবশ্যই আমরা সমাজ সচেতন। যারা সমাজ সচেতন, যারা সত্য কথা বলতে ভয় পায় না, সততার সঙ্গে ব্যবসা করতে চায়, তারাই বাজারে টিকে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। বাকি যারা অসৎ ব্যবসায়ী, তাদের আটকাবেন কীভাবে? আমরা অনেক ডেভেলপার চট্টগ্রামের। চট্টগ্রামের উন্নয়ন হওয়ার কথা ছিলো, আমাদের কাছে মনে হচ্ছে এটাও ঢাকার মতো একটা কংক্রিটের সিটি হয়ে যাচ্ছে।

অনেকে চট্টগ্রাম গেলে অবস্থাটা দেখতে পারবেন এখন কিন্তু সময় এসে গেছে অবস্থা বদলের। মূল কারণ যেটা তানভীরের কথায় আসছি, আমরা ১৫০ বা ৫০ বছর সামনে রেখে একটা মাস্টারপ্ল্যান করি। গত ১০ বছর বারবার কথাটা বলে আসছি। প্রচুর বৈঠক করেছি রাজউকের সঙ্গে। কিন্তু সেটা হচ্ছে না।

ঢাকায় যেসব কনস্ট্রাকশন ও ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, আমার মনে হয় রিহ্যাবের সদস্যরা সবচেয়ে বেশি নিয়ম মানে। এখানে কোনো রেগুলেটরি বোর্ড নেই। এ জন্য রিহ্যাব সদস্যদের ওপরই চাপটা আসছে

শরীফ হোসেন ভূঁইয়া
সিনিয়র ম্যানেজার, শেলটেক

আমাদের বড় একটা হতাশা হলো, বিভিন্ন প্ল্যান হয়। কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়ন করতে পারি না। ইদানীং পরিবেশের স্বার্থে বিল্ডেবল এরিয়া কমানোর জন্য বলা হচ্ছে

হাসিব এম আব্দুল্লাহ
মার্কেটিং ম্যানেজার, আরবান ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট

Born to Build
SHAH CEMENT

আমার মনে হয় হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আমরা সক্ষম। শুধু সঠিকভাবে কাজগুলো করতে হবে। আমরা হতাশ হবো না। আমরা যারা সমাজ সচেতন ব্যবসায়ী তারা হতাশ না। আমাদের যদি সততা থাকে তাহলে সবকিছুই সম্ভব।

এখানে কয়েকটা কথা, ডেন্টিংয়ের ব্যাপারটা বলা হলো। বুয়েটের এক ভাই বললেন, যেখানে পার্টনারশিপ ডেভেলপমেন্ট হয়নি সেখানে বিল্ডিং অ্যাপার্টমেন্ট আমরা কেন করি। বাইরে যেটা হয়, ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানগুলো ডেভেলপারদের ফাইন্যান্স করে বিরাট আকারে। তাছাড়া পাবলিক ফাইন্যান্স থেকে শেয়ারের মাধ্যমেও টাকাটা সংগ্রহ করে। অনেক উপায়ে তারা টাকা সংগ্রহ করে। টাকা নিয়ে তারা কাজগুলো করে। এবং পরবর্তীতে এটা ট্রান্সফার হয়ে যায় যারা অ্যাপার্টমেন্ট কিনছে তাদের ওপর। আমি নিজে দেখেছি, একটা ফরম পূরণ করছে, অ্যাপার্টমেন্ট তার হয়ে যাচ্ছে। একটা লম্বা সময়ের জন্য ৩% সুদে চুক্তিটা করছে। কোথাও তাদের দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে না।

এত সহজভাবে সেখানে ব্যাপারটা ঘটছে। সেখানে একটা সেকেন্ডারি মার্কেট আছে। আমাদের দেশে ডেভেলপারদের ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি মার্কেটটা এখনোও গড়ে ওঠেনি। লো-কস্ট হাউজিংয়ের একটা ব্যাপার আছে যেটা সব সময় আমাদের শুনতে হয়। এরকম না যে, আমার খরচ পড়ল ১০ লাখ টাকা, আমি ৫ লাখ টাকায় সেটা বিক্রি করবো। সেটা হতে পারে না। লো-কস্ট বলতে আমার যে মোট খরচ হবে সেটা যেন কম হয়। যেন কম খরচে দিতে পারি। আমরা যারা ডেভেলপার, আমাদের আকর্ষণ থাকে ব্যবসা কোথায় ভালো হবে। এজন্যই ঢাকার অবস্থাটা দেখেন, সবাই গুলশান-ধানমন্ডির দিকে যাচ্ছে। সেসব জায়গায় স্বাভাবিকভাবে জমির দাম বেশি, পুরো কনস্ট্রাকশন প্রায় ৪০%। মধ্যবিত্তদেরও সেখানে যাওয়া সম্ভব না। তাহলে জমির দাম যেখানে কম, কনস্ট্রাকশন ব্যয় সব জায়গাই এক রকম। আমাদের দরকার কম দামের জমি। ঢাকা শহরে কমদামের জমিটা কোথায়? তাহলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের আবাসন দিতে হলে ঢাকার বাইরে যেতে হবে। ঢাকা শহরে সেটা সম্ভব না। এক সময় আমরা ধানমন্ডিতে ডেভেলপ করেছি, যেখানে জমির দাম ছিলো মাত্র ৭-৮ টাকা। এখন সেটা বেড়ে হয়েছে ৪০ লাখ টাকা।

পরিকল্পিত অ্যাপার্টমেন্ট করাও সম্ভব হচ্ছে না। যেখানে অ্যাপার্টমেন্ট হয় ২৫টা, জমির মালিক চাচ্ছেন অ্যাপার্টমেন্ট হোক ৫০টা। আমাদের তো ব্যবসা করে যেতে হবে তাই না? আবার আর্কিটেক্টদেরও দোষ দেয়া যায় না। তাদের দিয়ে এভাবেই করিয়ে নেয়া হচ্ছে। আমাদের দেশে লো-কস্ট হাউজিংয়ের জন্য ঢাকার ভিতরে না থেকে, ঢাকার বাইরে কোনো জায়গা নিতে হবে। আবার সেখান থেকে যেন সহজে আসা যায়, সেই ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা রাখতে হবে। যেমন মুম্বাই শহরটা, সবাই সেখানে থাকতে পারে না। প্রায় ৪০ লাখ লোক প্রতিদিন সেখানে আসা-যাওয়া করে। আমরা ডেভেলপাররা যেকোনো জায়গায় যেতে প্রস্তুত। কারণ মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশ যাদের বাড়ি দরকার তাদের আমরা বাড়ি দিতে পারছি না। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা ডেভেলপাররা যাদের একটা বাড়ি আছে, তাদের আরেকটা বাড়ি করে দিচ্ছি। কিন্তু যাদের মূলত আবাসন সমস্যার সমাধান করা দরকার আমরা সেটা পারছি না। সমাজের একটা বৃহৎ অংশকে আমরা বাদ দিচ্ছি। একটা হলো, আমাদের কম মূল্যে জমি দরকার এবং বিশাল ফাইন্যান্স দরকার। ফাইন্যান্সটা এটার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই সেক্টরকে শেয়ার করা মূলত সরকারের সঙ্গে মিলে করা। আমরা কয়েকবারই এ প্রস্তাব করেছি। সরকারকে বলছি, আপনারা আমাদের সঙ্গে আসেন। আপনারা কোনো জায়গা দিয়ে দিতে পারেন অথবা আমাদের সঙ্গে যৌথ চুক্তিতে আসতে পারেন। জানি না সরকারের কী মতামত। সরকারের সঙ্গে আমাদে শেষ মিটিংয়ে বলা হয়েছিলো, রাজউক একটা ডেভেলপার হয়ে থাকবে। রাজউকই মধ্যবিত্তের জন্য কাজ করবে। আমরা একটা মান নিয়ন্ত্রণ বা আমরা সব কোম্পানির সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। আমরা কীভাবে নিশ্চিত করবো আমাদের অ্যাপার্টমেন্টগুলো ঠিকভাবে গ্রাহকরা পাচ্ছে কি না। এটা একটা বড় সমস্যা। ফাইন্যান্স একটা বড় সমস্যা। কাস্টমারদের কাছে অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রির সময় একটা তো প্রাথমিক টাকা দেয়। এরপর টাকাগুলো নিয়মিত দিতে হবে। সমস্যা আছেই। তো সেগুলো সমাধানে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

গোলাম মোর্তোজা : ধন্যবাদ। আপনি বেশ বিস্তারিত বলেছেন। এখানে বিভিন্ন কোম্পানির যারা বসে আছেন তাদের সবারই বক্তব্য শুনবো। এখানে কয়েকজন আর্কিটেক্ট আছেন, যারা কথা বলতে চান, তাদের পরে মোজাফ্ফর আহমদ স্যারের বক্তব্য দিয়ে আমাদের আলোচনা শেষ করব। তার আগে আখতার হোসেন বলবেন।

আখতার হোসেন : ধন্যবাদ মডারেটর। সাপ্তাহিক ২০০০ এবং শাহ সিমেন্টকে ধন্যবাদ এরকম একটা অনুষ্ঠান করার জন্য। আসলে বিপু ভাই সব বলে ফেলেছেন। তবু একটা জিনিস অনেকবার এসেছে এ আলোচনায়। লো-কস্টে অ্যাপার্টমেন্ট দেওয়ার ব্যাপারটা। ম্যাটেরিয়ালসের দাম তো কমানো সম্ভব না। তাহলে কম দামে অ্যাপার্টমেন্ট দেওয়া যায়? রাজউক বা অন্যভাবে জমি কিনছে মানুষ। সেখানে আবার ২-৩ গুণ দাম বেড়ে যাচ্ছে যখন জমিটা ডেভেলপারদের কাছে আসছে। তাই অ্যাপার্টমেন্টের ওদাম বেড়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় সরকার যদি সরাসরি ডেভেলপার কোম্পানিগুলোকে জমি দেয়, তাহলে আমরা কম দামে অ্যাপার্টমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি। রেজিস্ট্রেশন খরচটাও আরো কমিয়ে দেয়া সম্ভব । কমিয়ে দিলে রেজিস্ট্রেশন আরও বেশি হবে। সমস্যা তৈরি হচ্ছে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে। আমার মনে হয় পুরো লোনটাই ডেভেলপারকে দিয়ে দেয়া যায়।

তখন কাস্টমারের কাছে সেটা এমনিতেই চলে যাবে। এবং মেয়াদটা আরো বাড়ালে ভালো হয়। তাহলে ইনস্টলমেন্টগুলো ছোট হয়ে যাবে এবং সবার আয়ত্তে চলে আসবে। আর ঢালাওভাবে ডেভেলপারদের চাপ দেয়া হচ্ছে। পানি ঢালু জায়গায় ছেড়ে দিলে তো চলেই যাবে। কোনো রেগুলেটরি কমিটি নেই, কিছু নেই। তাই প্রত্যেকটা কোম্পানিকে কিছু বিষয় মেনে চলা উচিত। এখন কিন্তু সব অ্যাপার্টমেন্ট লাক্সারিয়াস হচ্ছে না। সবার জন্যই তৈরি হচ্ছে। এখন ডেভেলপারদের কিছু বিষয়ে নজর দেয়া দরকার যে মাটি পরীক্ষা বা স্ট্রাকচারাল ডিজাইন করতে অল্প টাকা লাগে। সাধারণ ক্রেতারা এগুলো কম বোঝেন। আমাদের ডেভেলপারদের নীতিতে ঠিক থাকা উচিত যেন বিল্ডিংয়ের সুপারস্ট্রাকচার বা ফ্রেম মজবুত হয় এবং ভালো থাকে। এগুলো

নগরে আলাদা রাস্তা, শিল্প এলাকা, বাণিজ্যিক এলাকা থাকবে। যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকবে। এগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক থাকলেই নগরায়ণটা গড়ে ওঠে

শরীফ মো: তারেকুজ্জামান
প্ল্যানার, নগর উন্নয়ণ অধিদপ্তর

ডেভেলপারদের দেখা দরকার। আর রিহ্যাবের সক্রিয় হওয়া দরকার। বাইরের অ্যাপার্টমেন্ট কেউ কিনলে সেটা নিজ দায়িত্বে কিনবে। কোম্পানিগুলোর দূরদর্শী দৃষ্টি থাকা দরকার, সেটা না থাকলে অঘটনগুলো ঘটতেই থাকবে। ডেভেলপারদের পক্ষ একা কিছু করা সম্ভব না। তারা প্রচুর প্রতিবন্ধকতার ভেতরে কাজ করে। তারপরও সবাই যার যার জায়গা থেকে স্বচ্ছ হয়ে গেলে ঠিকমতো কাজ করতে পারবো এবং সুন্দর একটা পরিবেশ গড়ে তুলতে পারবো।

হাসিব এম আবদুল্লাহ : ধন্যবাদ সাপ্তাহিক ২০০০ এবং শাহ্ সিমেন্টকে যৌথভাবে অনুষ্ঠানটা আয়োজনের জন্য। চমৎকার এবং পজেটিভ কিছু বিষয় আজকে এসেছে। আমাদের বড় একটা হতাশা হলো, বিভিন্ন প্ল্যান হয়। কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়ন করতে পারি না।

সরকার থেকে কাঁচামাল আমদানি, পরিকল্পিত রাস্তাঘাট, এসব ব্যাপারগুলোয় সুবিধা দিতে পারলে আরো অনেক কিছু করা সম্ভব বলে মনে করি

মৃণাল বিশ্বাস
ম্যানেজার(প্রশাসন), এভালন ডেভেলপমেন্ট

ইদানীং পরিবেশের স্বার্থে বিল্ডেবল এরিয়া কমানোর জন্য বলা হচ্ছে। এ রকম ক্ষেত্র বা আইন এলে তখন বিভিন্ন বাধা আসে। রিয়েল এস্টেটের ক্ষেত্রে আইন করে বলা হলো, কালকে থেকে এটার ইনক্রিমেন্ট হবে। অনেক সময়ই আমরা বাস্তব অবস্থাটা বিবেচনা করি না। এ রকম নিয়ন্ত্রণের আইন করতে হলে আমাদের প্রস্তাবনা হলো, বিল্ডেবল এরিয়া কমানো হোক বা এখন যেদিকে ডেভেলপ হচ্ছে ধানমন্ডি, গুলশান এসব ক্ষেত্রে এটা করতে হবে। এখন থেকে হয়তো ২ বছর পর বাস্তবায়ন করতে হবে। এখন যেসব জায়গায় এই আইন করা যায় যেমন, পূর্বাচল। এসব জায়গায় এই আইন করে ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। ধন্যবাদ-

মৃণাল বিশ্বাস : এখানে আলোনার ক্ষেত্রে আমি মনে করি কিছু ব্যাপার একটি পর্যায় থেকে আরেকটি পর্যায়ে চলে যায়। যেমন ম্যাটেরিয়ালস বা জমির দাম বেড়ে যাচ্ছে। আমরা যদি পরিকল্পিত নগরায়ণ করার চেষ্টা করি সেখানে সবকিছু ঢেলে করা সম্ভব না। অবশ্যই সরকার থেকে একটা বিল্ডিং তৈরির জন্য নিয়ম আছে। সেসব ক্ষেত্রে আরো নিয়মতান্ত্রিক অবস্থা তৈরি করা সম্ভব হলে আমরা ডেভেলপাররা অনেককিছু করতে পারি। সরকার থেকে কাঁচামাল আমদানি, পরিকল্পিত রাস্তাঘাট, এসব ব্যাপারগুলোয় সুবিধা দিতে পারলে আরো অনেক কিছু করা সম্ভব বলে মনে করি। ধন্যবাদ।

শরীফ হোসেন ভুঁইয়া : কয়েকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। যেমন- নিয়মের কথা বললেন, অন্তত রিহ্যাব মেম্বাররা অবশ্যই নিয়মনীতির ভেতরে আসতে চাইবেন। ঢাকায় যেসব কনস্ট্রাকশন ও ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, আমার মনে হয় রিহ্যাবের সদস্যরা সবচেয়ে বেশি নিয়ম মানে। খুব ছোট অংশ রিহ্যাব সদস্যরা ডেভেলপ করছে। বাকি অংশ নিজেরা বা কনট্রাক্টররা করছে। এখানে কোনো রেগুলেটরি বোর্ড নেই। এ জন্য রিহ্যাব সদস্যদের ওপরই চাপটা আসছে। আসলে গুলশান, ধানমন্ডি, বনানী, উত্তরা এসব এলাকায় খুব কম নিয়ম ভাঙা হচ্ছে। দু-একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, আমরা বলছি পরিকল্পিত নগরায়ণ ও আবাসন। ড. নজরুল ইসলাম স্যার বলে গেছেন স্বাধীনতার আগে ও পরে পরিকল্পিতভাবে যেগুলো হয়েছে, আসলে সেগুলো কি আবাসন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে? ধানমন্ডি বা গুলশানে অনেক বেশি স্কুল-কলেজ, কমিউনিটি সেন্টার থাকার কারণে যাতায়াতে অসুবিধা হচ্ছে। এগুলোরও নিয়ন্ত্রণ থাকাটা দরকার ছিল। ধন্যবাদ।

শাহরিয়ার ইকবাল রাজ : আজকে আলোচনায় অনেক বিষয় বেরিয়ে এসেছে। তবে আমরা ডেভেলপাররা কিছু বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া উচিত বলে মনে করি। ডেভেলপাররা বিল্ডিং তৈরি করবেই। মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ হলো নিয়ম-নীতি ও সেগুলোর বাস্তবায়ন। বলা হচ্ছে নিয়ম ভাঙার কথা। অর্থাৎ পুরনো যে নিয়মগুলো ছিলো সেগুলো আর চলছে না। সেগুলোকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে হবে। এ ব্যাপারটা নিয়ে আমরা খুব বেশি আলোচনা করছি না। দুঃখজনকভাবে বলতে হয়, খুব অল্প সময়ের মধ্যে দুটো আলোচনায় অংশ নিলাম। কয়েকটা প্রশ্ন ছিলো প্রধান অতিথির কাছে। তিনি নেই, তবু মনে হয় প্রশ্নগুলো তোলা দরকার। প্রথমত, আমরা হাইরাইজ করছি। একটা ঘটনার সূত্র ধরে বলি, জাপান গার্ডেন সিটি তৈরি হচ্ছে, কারণ মানুষ থাকবে। এদের সাহায্য করার জন্য যারা থাকবে, তাদেরও তো আরো ৫ জন মিলে একটা পরিবার। তারা থাকবে কোথায়? চট্টগ্রামে এই সমস্যাটা হয়েছিলো। পরে সমাধান করা হয়। রিহ্যাবের কথা বলা হচ্ছে। রিহ্যাবকে সাধারণ মানুষ চেনে কারণ তারা বছরে ২টা প্রোপার্টি ফেয়ার

Born to Build
SHAH CEMENT

আর হঠাৎ করে পত্রিকায় ঘোষণা দিয়ে দাম বাড়ানো। এ ধরনের বডির তাহলে সত্যিই কতোটুকু দরকার আছে প্রশ্নটা জনগণের কাছ থেকে আসতেই পারে। আমরা অনেক কিছু করতে চাচ্ছি। তার মধ্যে একটা হলো আসাদ গেটে ঝুলন্ত মিউজিয়াম তৈরি করবো। কে দেখতে আসবে, আর কীভাবে আসবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আরেকটা হলো, মহাখালীর জাহাঙ্গীর গেট থেকে মাটি খুঁড়ে চলে যাবো আগারগাঁও। কী দরকারে? বিজয় সরণির একটু আগে একটা সাইনবোর্ড দেখা যায়, সামরিক এলাকা শুরু। ২-৩টা ট্যাংক দিয়ে একটা মিউজিয়াম। কে আসবে, কীভাবে আসবে জানি না। সব দেখে মনে হয় আমরা আল্লার ওয়াস্তে বেঁচে আছি। তবে সবাই যদি সবার জায়গা থেকে এগিয়ে আসি তাহলেই সমস্যাগুলোর সমাধান করা যাবে। ধন্যবাদ।

ড. মোজাফ্ফর আহমদ : আমার অনেকগুলো প্রশ্ন আছে। সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে আপনারা নিজেদের মধ্যে যখন আলোচনা করেন, রাজউকের সঙ্গে যখন আলোচনা করেন, জমির মালিকের সঙ্গে যখন আলোচনা করেন, তখন যেভাবে করেন এছাড়াও কি অন্য কোনো পক্ষ নেই? অন্য আরেকটা পক্ষ আছে, তারা হলো বিল্ডিংয়ের পাশে যারা থাকবে, তাদের বাড়িতে আলো ঢুকবে কি না! এই বাড়ির এয়ারকন্ডিশনারে ঐ বাড়িতে শব্দদূষণ হবে কি না। শব্দদূষণ হবে কি না এই প্রশ্নের উত্তর কি নিজেদের চিন্তা-চেতনায় নেন? আমার মনে হয় না এ বিষয়ে আপনারা আগ্রহী। আলোচনার শুরুতে বিষয় ছিল পরিকল্পিত নগরায়ণ। দুর্ভাগ্য যে আমরা পরিকল্পনা ছেড়ে দিয়েছি এবং এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ একটু আগে যেটা বলা হলো ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা। এখন ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা আর আবাসিক এলাকা নেই। ডেভেলপারদের আন্ডারে একটা গুচ্ছ এলাকা। ধানমন্ডির পরিবেশ রক্ষা করার জন্য একটা গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। এ অবস্থার জন্য আমি মূলত ডেভেলপারদের দায়ী করবো। যাদের ফ্ল্যাটগুলোতে অফিস করলে বেশি ভাড়া পাওয়া যায়; হাসপাতাল, স্কুল, ইউনিভার্সিটি করলে বেশি ভাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু ধানমন্ডি সম্পর্কে রাজউকের একটা নিয়ম আছে। দুটো রাস্তার দুপাশ বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা যাবে। এর বাইরে অন্য কোথাও কিছু করা যাবে না। কিন্তু তাহলে এগুলো হচ্ছে কীভাবে? রাজউক

Born to Build
SHAH CEMENT

তো নয়, গণপূর্ত অধিদপ্তরে এর একটি পরিচালনা পর্ষদ আছে। তাদের কাছে নালিশ করেও কোনো কাজ হয়নি। বর্তমানে হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন পেন্ডিং আছে এ বিষয়ে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের সঙ্গে যে চুক্তি সে অনুযায়ী আবাসিক এলাকায় এগুলো হওয়ার কথা নয়। তাহলে হচ্ছে কেন? চুক্তি কিন্তু বাস্তবায়ন হচ্ছে আমাদের কোর্টের অবস্থার জন্য। ব্যাপকহারে যখন ধানমন্ডিতে বাণিজ্যিকীকরণ শুরু হলো, বড় আকারে যে প্রতিবাদ হয়নি তা কিন্তু নয়। বেক্সিমকো, বিডিআর এবং পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার ষড়যন্ত্র করে ২ নম্বর রাস্তা বাণিজ্যিক করে ফেলে। এবং এক সময় একে বেক্সিমকো রোড নাম দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। তখন থেকেই প্রতিবাদ শুরু হয়। সত্তরের দশকে বাংলাদেশ অবজারভার এবং পরবর্তী ডেইলি স্টার ঘাঁটলে দেখবেন শত শত চিঠি লেখা হয়েছে। ধানমন্ডি লেকটা বিবর্ণ করে দিয়ে বিডিআর রাইফেলস স্কয়ার নির্মাণ করেছে। তাদের ভেতরে কিন্তু দেখবেন সুন্দর আবাসন ব্যবস্থা। কিন্তু ঐ স্কয়ারটা করে পুরো ২ নম্বর রোডটাকে যানজটে পূর্ণ করে দিয়েছে। তখন কথা ছিল যে, তাদের ভেতর দিয়ে তারা নিউমার্কেটে যাবার রাস্তা উন্মুক্ত করে দেবে। সে চুক্তি তারা রাখেনি। তারা পরিবর্তে যেটি করতে চেয়েছিলো তা হলো তিন নম্বর রাস্তার একটা রুট করতে। কিন্তু পরে ধানমন্ডিবাসীর চাপে তা করা হয়নি। তারা এক জায়গার জ্যাম আরেক জায়গায় শিফট করতে রাজি হয়নি। প্রথমে ২৭ নম্বর ও সাতমসজিদ রোড বাণিজ্যিক করার পর প্রতিবাদ না হলেও ২ নম্বরকে করার পরে হয়েছে। বাণিজ্যিকায়নের ফলে কিছু কিছু লোক যাদের সামর্থ্য আছে তারা অন্যত্র চলে গেছে। যেমন সাইফুজ্জামান তখনকার সময়ে ৫ লাখ টাকা ব্যয় করে বাড়িটা সুন্দর করে IFIC ব্যাংকের কাছে ভাড়া দিয়েছে। তার পক্ষে এটা সম্ভব। কিন্তু সবার পক্ষে নয়। সুতরাং এই যে একজন মানুষের কাছে আবাসিক এলাকার নাম করে জমি বিক্রি করে তার কাছ থেকে থাকার অধিকারটুকু কেড়ে নেয়া হচ্ছে। এ অধিকার কেড়ে নেয়ার অধিকার কিন্তু কেউ তাকে দেয়নি। এ প্রশ্নটাই কিন্তু এখন মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে আলোচনা হয় যে, আমার অধিকার কিন্তু আমি পাচ্ছি না। এ অধিকার কিন্তু কেড়ে নিচ্ছে কোটিপতিরা। দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমি বলবো তা হলো, ডেভেলপারদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটা মনিটর করা দরকার। দরকার কর আদায় এবং ক্রেতাদের সুবিধার্থে। সুতরাং রিহ্যাব যদি তার নীতি প্রণয়ন করতে চায় তাহলে ডেভেলপার এবং ক্রেতাদের মধ্যকার লেনদেনটা দেখতে হবে। সুতরাং পাবলিকদের সঙ্গে যদি সংলাপ করতে চায় রিহ্যাবকে এ মুহূর্তে সে উদ্যোগ নিতে হবে। তারপর আপনারা ১৭০ জন একসঙ্গে। এই একতা অনেক কিছু করতে পারে। আমি অনেক কিছু করতে পারি না। অসহায় হয়ে পড়ি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আপনাদের ডেল্টা, ব্র্যাক হাউজিং। ব্র্যাক নিজে টাকা খরচ না করে তা সংগ্রহ করতে চায় সদস্যদের কাছ থেকে। অথচ এর নাম করে তারা আপনাদের কাছ থেকে ঠিকই লোন নিয়েছে। আর বলে বেড়ায়, আমরা দরিদ্র মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা করছি। কিন্তু আমার প্রশ্ন হবে, মাইক্রোক্রেডিটের যে আইন কানুন আছে তাতে এটি ধরা হচ্ছে না কেন? আপনাদের সঙ্গে এ রকম কে কে যুক্ত হচ্ছে তা দেখা কিন্তু রিহ্যাবের দায়িত্ব।

আর নগরায়ণের যে নিয়ম-কানুন তা যারা ঢাকা শহরে বাস করে তাদের না জানার কথা নয়। আমি যদি ৬ তলা বাড়ি করতে যাই তাহলে আমার বিদ্যুতের লাইনে ৬ তলা বাড়ির চাহিদা মিটবে কি না তা ডেসা দেখছে না। অথচ সেখানে ডেভেলপাররা মার্কেট নির্মাণ করলে তারা কিন্তু সেই রকম লাইন জোগাড় করে ফেলে।

আমি যখন বাড়ি করেছিলাম তখন নিউমার্কেট থেকে আমার বাড়িতে রিকশা যেতে চাইতো না। আর এখন বাসের শব্দে রাত ১২টার আগে ঘুমাতে পারি না। এই পরিবর্তনের কথাও সত্যি। কিন্তু ভূমি ব্যবস্থায় যখন পরিবর্তন আসে, সেই পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার জন্য সময় দিতে হবে। আমার ক্ষেত্রে যেমন ধানমন্ডিতে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সময় দেয়া হচ্ছে ৫-১০ বছর। এতো অল্প সময়ে খাপ খাওয়ানো যায় না। আমেরিকায় একটি জিনিস দেখবেন, সেখানে হাউজিং ব্যবসা উন্নত হলেও রিয়েল এস্টেট ব্যবসা প্রসার লাভ করেনি। এর কারণ হলো, একমাত্র হাউজিং ব্যবসায় কোনো কর দিতে হয় না। সেখানকার মানুষ হাউজিং লোন নিয়ে সরাসরি বাড়ি করার দিকেই ঝোঁকে বেশি।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, আমার প্রতিবেশী কারা? সে কি ক্রিমিনাল? এখন খেয়াল করে দেখবেন ধানমন্ডিতে খুন হয়, ডাকাতি হয়। অথচ এক সময় এ এলাকা ঢাকার সবচেয়ে নিরিবিলি ছিল। এবং এগুলো হচ্ছে অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে। এ সমস্যার উৎসটা কি জানেন? অ্যাপার্টমেন্টটা কার কাছে বিক্রি করা হচ্ছে তা কিন্তু ডেভেলপার জানে, অন্য কেউ নয়। এ সুযোগে অনেক খারাপ লোক এসব অ্যাপার্টমেন্টে আস্তানা গাড়ছে। আর একটা সমস্যা হলো অ্যাপার্টমেন্টের ম্যানেজমেন্ট সমস্যা। অনেক অ্যাপার্টমেন্টের খবর জানি যেখানে প্রতি মাসে টাকা দিতে হয় ক্রেতাদের। অথচ তারা দিতে চায় না। তারা বলে, এককালীন তো সব দিলামই। কমন সার্ভিসগুলোকে কেন্দ্র করে এ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। অন্তত দুটি ক্ষেত্রে এগুলো মামলা পর্যন্ত গড়িয়েছে। চুক্তিতে কোনো কোনো সময় ম্যানেজমেন্টের খরচের উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে দেখা যায় তারচেয়ে বেশি লাগছে। সেটি নিয়ে সমস্যা হয়। আমার মনে হয় ভবন নির্মাণের সময় যে কনট্রাক্টে দেয়া হয়, তেমনি পরবর্তী বিষয়গুলো দেখার জন্যেও দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে দেয়া যেতে পারে। যারা আবাসন নির্মাণ করছে তারা তো এর পরিবেশটা রক্ষার দায়িত্বও নিতে পারে। আপনাদের ধন্যবাদ।

গোলাম মোর্তোজা : আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এতো সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এতো মানুষের আবাসনের জন্য আমাদের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে। সবাই মিলে আলোচনা করলে একটা সমাধানের পথ বেরিয়ে আসবে। এ সমস্যাগুলো কতো দ্রুত বা কতো সময় নিয়ে সমাধান হবে সেটি আমরা বলতে পারি না। তবে এ রকম আলোচনা করলে নিশ্চয়ই একটা সমাধানের পথ বের হবে। আমরা এ কাজগুলো করতে চাই এবং সবাইকে নিয়ে করতে চাই। আপনাদের সাবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি।

> আমাদের ডেভেলপারদের নীতিতে ঠিক থাকা উচিত যেন বিল্ডিংয়ের সুপারস্ট্রাকচার বা ফ্রেম মজবুত হয় এবং ভালো থাকে। এগুলো ডেভেলপারদের দেখা দরকার। আর রিহ্যাবের সক্রিয় হওয়া দরকার
>
> **আখতার হোসেন**
> ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এরিস্টো ডেভেলপমেন্ট

সহযোগিতায় : **সামিউল ইসলাম, শাহিদ হোসেন**
অনুলিখন : **হাসান জামান, মাহমুদ রাজু, নাজনীন জাহান, শফিকুল লাভলু**
গ্রাফিক্স : **শেখ মঈনুল ইসলাম রনি**
ছবি : **তুহিন হোসেন ও সালাহ্ উদ্দিন টিটো**